এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স

ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

Association of Land & Land Reforms Officers, West Bengal

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক)

রাজ্য সম্মেলন

বিশেষ সংখ্যা ২০২০

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স,
ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

আলো

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য-সম্মেলন
১১-১২ই জানুয়ারী, ২০২০
কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম
শিলিগুড়ি

বিশেষ সংখ্যা

পত্রিকা উপসমিতি

মনোরঞ্জন চৌধুরী, ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, প্রণব দত্ত, অলোক গুপ্ত,
অরিন্দম বক্সী, অজিত দত্ত, কৃশানু দেব, আশিস গুপ্ত,
দেবব্রত ঘোষ, বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী

সম্পাদক
অম্লান দে

সূচীপত্র

			পৃ.
১.	আমাদের কথা		৩
২.	সপ্তদশ রাজ্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটি		৪
৩.	সম্মেলন-পরিক্রমা		৬
৪.	আধুনিক বাঙালি মননের ভগীরথ— অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কৃশানু দেব	১৭
৫.	লেনিন—আজও প্রাসঙ্গিক	অরিন্দম বক্সী	৩৩
৬.	জন্মশতবর্ষের আলোয় সোমেন চন্দ	প্রণব দত্ত	৩৯
	ক্রোড়পত্র : প্যান্ডেমিক		
৭.	প্যান্ডেমিকের আলোছায়া ও পথের দাবী	অম্লান দে	৪৯
৮.	অতিমারী—বিশ্ব শ্রমজীবীদের কণ্ঠস্বর	দেবব্রত ঘোষ	৫৩
৯.	সাহিত্যের চালচিত্রে মহামারী	বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী	৬১
	সচিত্র প্রতিবেদন		
১০.	'মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও'—সংকলন ও বিন্যাস : শুভ্রাংশু বসু		

লেখক-পরিচিতি

১. **কৃশানু দেব** .... সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক

২. **অরিন্দম বক্সী** .... সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

৩. **প্রণব দত্ত** .... কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

৪. **অম্লান দে** .... সমিতির মুখপত্র 'আলো'-র সম্পাদক

৫. **দেবব্রত ঘোষ** .... সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি

৬. **বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী** .... সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

৭. **শুভ্রাংশু বসু** .... সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক, সাইবার উপ-সমিতির আহ্বায়ক

আমাদের কথা

সংগঠনের সংগ্রাম-আন্দোলনের প্রবহমান ধারায় 'সম্মেলন' যে উত্তুঙ্গতার শিখর স্পর্শ করে তার উত্তাপকে ধারণ করেই গত ১০-১২ই জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে শিলিগুড়ি শহরের বুকে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের প্রিয় সমিতি অ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন। রাজ্য সম্মেলন মঞ্চ মুখর ছিল আমাদের নিজস্ব দাবী-দাওয়া, অধিকার অর্জনের চাহিদায়, অর্জিত অধিকারসমূহ হরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে; একইসঙ্গে দেশ-দুনিয়ার সামগ্রিক পরিবহে সংগ্রাম-আন্দোলনের গতিধারার সঠিক স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের সুচিন্তিত প্রয়াস বিদ্যমান ছিল প্রতিনিধিদের বক্তব্যে।

সম্মেলন-স্মরণিকারূপে সমিতির মুখপত্র 'আলো'-র এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের সূত্রে আমরাও বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি চলমান পরিস্থিতির নানান বাঁকচোরের দিকে। আবার আগামীর দিগ্বলয়ের সন্ধানে 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতির অমোঘ সূত্রাবলীর দিকেও বারংবার ফিরে তাকাতে হয়। এ-দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখেই পরিকল্পনা ও বিন্যাস করা হয়েছে বর্তমান সংখ্যাটির।

বিগত জানুয়ারি মাসে সমিতির সপ্তদশ সম্মেলন সমাপ্ত হবার কিছুদিনের মধ্যেই গোটা বিশ্বজুড়ে 'কোভিড-১৯' অতিমারীর প্রাদুর্ভাব স্তব্ধ করে দিয়েছিল জগৎজোড়া 'কালের চিরচঞ্চল গতি।' বিমূঢ়তা ও বিপন্নতার আবহে কেঁপে উঠেছিল মানবসভ্যতা, যার রেশ এখনো বিদ্যমান। তবু এরই মধ্যে জারি হল ঘুরে দাঁড়নোর লড়াই, ঝড়ে ভাঙা ঘর বলিষ্ঠ বাহুতে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। এই সংখ্যায় 'প্যান্ডেমিক' ক্রোড়পত্রে অতিমারীর সর্বব্যাপ্ত প্রভাবের কয়েকটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তিনটি লেখায় । সেইসঙ্গে একটি সচিত্র প্রতিবেদনে ধরা রইলো রাজ্যের দুর্গত মানুষজনের পাশে দাঁড়ানোর সাধ্যমত প্রয়াসে সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচীর একটি তথ্যনিষ্ঠ বিবরণী—'মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।'

যে সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা 'সম্মেলন' সম্পন্ন করেছি সেই বছরটিতে একই সঙ্গে বঙ্গীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মের দ্বি-শতবর্ষ, মহামতি লেনিনের জন্মের ১৫০ বছর এবং মাত্র বাইশ বছর বয়সে ফ্যাসিবাদী হামলায় নিহত তরুণ ও প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিক সোমেন চন্দের জন্মশতবর্ষ। এঁদের জীবনকৃতি ও অবদানকে স্মরণে রেখে তিনটি লেখা মুদ্রিত করা হয়েছে এই সংখ্যায় যা কোন নিছক প্রথাকৃত্য নয়, বরং একথাই বলা যায়—চলমান সময়ের পটে তাঁদের স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা নতুন করে আলোকিত করতে চেয়েছি আমাদের বোধি ও মননকে।

বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই সংখ্যাটির মুদ্রণকার্যে অনেকটাই বিলম্ব ঘটেছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত। 'স্মরণিকা' প্রকাশের লগ্নে সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যে-সমস্ত সুধীজন ও শুভানুধ্যায়ীরা আমাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন, যে সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতা বন্ধুরা এই 'স্মরণিকা' উপলক্ষে অকৃপণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের পুনর্বার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। সমস্ত সহযোদ্ধা বন্ধুদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন

১১-১২ই জানুয়ারি, ২০২০

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম

শিলিগুড়ি

অভ্যর্থনা কমিটি

উপদেষ্টা মণ্ডলী : শ্রী প্রদীপ গুপ্তা, শ্রী নরেন কুমার সিং, শ্রী প্রবাল দাশগুপ্ত, শ্রী সুনীল বর্মন।

সভাপতি : ডঃ পার্থসারথি দাস

কার্যকরী সভাপতি : শ্রীমতী রিনঝি লামু শেরপা

সহ-সভাপতি : শ্রী নৃপেন সরকার, শ্রী ভিক্টর সাহা, শ্রী জয়দীপ ঘোষ রায়

সম্পাদক : শ্রীমনোতোষ অধিকারী

যুগ্ম-সম্পাদক : শ্রী শান্তনু প্রধান, শ্রীমতী নিমা ডোমা ভুটিয়া

দপ্তর সম্পাদক : শ্রী মোহন সিং রসাইলি

কোষাধ্যক্ষ : শ্রী শ্যাম দেওয়ান

উপসমিতি

দ প্ত র

আহ্বায়ক : শ্রী মোহন সিং রসাইলি

সদস্য : শ্রী দিলীপ সরকার, শ্রী প্রীতম রাই, শ্রী রামপ্রসাদ চাকী

ম ঞ্চ ও প্র চা র

আহ্বায়ক : শ্রী প্রহ্লাদ বর্মন

সদস্য : শ্রীমতী খুশবু লামা, শ্রী অভিজিৎ দাস, শ্রী মহেন্দ্র থাপা

অ র্থ

আহ্বায়ক : শ্রী শ্যাম দেওয়ান

সদস্য : শ্রী দাওয়া পেম্বা ডুকপা, শ্রী প্রভুনাথ সাউ

স্বা স্থ্য ও বু ক স্ট ল

আহ্বায়ক : শ্রী প্রসেনজিৎ সাহা

সদস্য : শ্রীমতী জ্যোতি লামা, শ্রী প্রদীপ লোহার, শ্রী রতন সাহা, শ্রী সোনম রুম্বা

প রি ব হ ণ

আহ্বায়ক : শ্রী কল্যাণ লামা

সদস্য : শ্রী অশোক পাল, শ্রী বিনোদ রায়, শ্রী ঋদ্ধি চক্রবর্ত্তী

ম হি লা

আহ্বায়ক : শ্রীমতী প্রীতি লামা

সদস্য : শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সেংগদেন, শ্রীমতী দীচেন ভূটিয়া, শ্রীমতী শেরিং ডি ভূটিয়া, শ্রীমতী কেশাং পেডাং ভূটিয়া

আ বা স ন

আহ্বায়ক : শ্রী ললিত রাজ থাপা

সদস্য : শ্রী গোপাল বিশ্বাস, শ্রী দীপেন লামা, শ্রী প্রজয় তামাং, শ্রী সুমিত ভট্টাচার্য্য

খা দ্য

আহ্বায়ক : শ্রী রূপক ভাওয়াল

সদস্য : শ্রী শুভ্রজিৎ মজুমদার, শ্রী অভিষেক চক্রবর্তী, শ্রী সুবিমল চক্রবর্তী

সা ং স্কৃ তি ক

আহ্বায়ক : শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনী দত্ত

সদস্য : শ্রীমতী প্রতিমা সুব্বা, শ্রী পবন গুপ্তা, শ্রী তাশি ভুটিয়া

স্বে চ্ছা সে ব ক

আহ্বায়ক : শ্রী তপন চক্রবর্তী

সদস্য : শ্রী সতীশ সুব্বা, শ্রী শুভেন্দু সামন্ত, শ্রী তেনজিং ভুটিয়া, শ্রী ধনঞ্জয় দাস

সম্মেলন পরিক্রমা

প্রথম রাজ্য সম্মেলনঃ ৯-১১ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ মৌলালী যুব কেন্দ্র, কলকাতা।
উদ্বোধকঃ রমনীকান্ত দেবশর্মা, বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
প্রধান অতিথিঃ অজয় মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি---অসিতবরণ দাস, সহঃ সভাপতি---দীপক সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম-সম্পাদক—নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক—সুকুমার দে, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—অরবিন্দ মন্ডল, সহ-কোষাধ্যক্ষ—পরেশ পাল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক—ষোড়শী প্রসাদ মিশ্র, দপ্তর সম্পাদক—রাধাচরণ লাহা।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) অজিত মন্ডল—কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগনা (উত্তর) ও ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)।
২) সুভাষ, কোঙার—বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া।
৩) অসিত সামন্ত—মালদা, পঃ দিনাজপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ।
৪) গণেশ রায়—দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি।

দ্বিতীয় (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ টাউনহল, বর্ধমান।
উদ্বোধক ঃ মলয় রায়, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।
প্রধান অতিথি ঃ শুভাশীষ গুপ্ত, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক।
বিশেষ অতিথি ঃ সমর বাওড়া, সম্পাদক, সারাভারত কৃষকসভা, বর্ধমান জেলাকমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, রাধাচরণ লাহা, সাদারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম সম্পাদক—নিমাই মুখার্জী, সহ-সম্পাদক—অরবিন্দ মন্ডল, সুব্রত ব্যানার্জী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, কোষাধ্যক্ষ—সুকুমার দে, সহঃ কোষাধ্যক্ষঃ—পরেশ পাল, পত্রিকা সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) সুভাষ কোঙার—বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, তমলুক, পুরুলিয়া ২। অরিন্দম বক্সী—মালদা,পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ৩। এরশাদ আলী—কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগনা (উত্তর) ও (দক্ষিণ)

৩য় (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ বহরমপুর কমার্স কলেজ, মুর্শিদাবাদ।

উদ্বোধকঃ মলয় রায়, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশেষ অতিথিঃ জয়নাল আবেদিন, কৃষক আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতৃত্ব ও সাংসদ এবং জোহাক আলি, সম্পাদক, সারাভারত কৃষকসভা, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, পরেশ চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম-সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সম্পাদক—অরবিন্দ মন্ডল, সুব্রত ব্যানার্জী, কোষাধ্যক্ষ—সুকুমার দে, সহ-কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, সদস্য—মোশারফ হোসেন, বিমল পাল চৌধুরী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অরিন্দম বক্সী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) অরিন্দম বক্সী—হুগলী, হাওড়া, তমলুক ২। এরশাদ আলী—উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা, নদীয়া ৩। সুভাষ কোঙার—মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ৪। দেবেন মাহাতো—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ৫। সুব্রত চক্রবর্তী—মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, ৬। গণেশ রায়—দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি।

৪র্থ (দ্বি-বাষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ অডিও ভিস্যুয়াল হল, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

উদ্বোধক ঃ মলয় রায়, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, পরেশ চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম-সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সম্পাদক—সুব্রত ব্যানার্জী, মোশারফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, হিসাব রক্ষক—বিমল পাল চৌধুরী, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, সদস্যগণ—অরিন্দম বক্সী, মৃণাল চক্রবর্তী, সম্পাদকমন্ডলীর স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্যগণ—সুকুমার দে, অরবিন্দ মন্ডল, দেবেন মাহাতো, পার্থ মুখার্জী, সুভাষ সামন্ত।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) গণেশ রায়—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চল ২। সুব্রত চক্রবর্তী—উঃ দিনাজপুর, দঃ দিনাজপুর মালদা অঞ্চল ৩। দেবেন মাহাতো—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, তমলুক অঞ্চল। ৪। আব্দুল আরিফ—বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অঞ্চল ৫। পার্থ মুখার্জী—হাওড়া, হুগলী, নদীয়া অঞ্চল ৬। সুভাষ সামন্ত—কলকাতা, উঃ ২৪ পরগণা, দঃ ২৪ পরগণা অঞ্চল।

৫ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ৯-১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ কমঃ অম্লান সেন মঞ্চ (বিদ্যাসাগর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়) মেদিনীপুর।

উদ্বোধক ঃ সুশীল ব্রহ্ম, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ তরুণ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ বিনয় চৌধুরী, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, পরেশ চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—মোশারফ হোসেন, সহ-সম্পাদক—সুব্রত ব্যানার্জী ও মৃণাল চক্রবর্তী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, হিসাব পরীক্ষক—বিমল পাল চৌধুরী, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য—সুভাষ শিকারী, অরিন্দম বক্সী, প্রণব দত্ত, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—দেবেন মাহাতো, সুভাষ সামন্ত, পার্থ মুখার্জী, অরবিন্দ মন্ডল।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সুভাষ সামন্ত—কলকাতা—দক্ষিণ ২৪ পরগণা—উত্তর ২৪ পরগণা ২। পার্থ মুখার্জী—হাওড়া-হুগলী-নদীয়া ৩। দেবেন মাহাতো—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-তমলুক-মেদিনীপুর ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদ ৫। গণেশ রায়—মালদহ-উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৬। সুনীল বর্মণ—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার।

৬ষ্ঠ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ৫-৭ই জুলাই, ১৯৯৮, কমরেড নীরেন চৌধুরী মঞ্চ, রবীন্দ্রভবন, চুঁচুড়া হুগলী।

উদ্বোধক ঃ স্মরজিৎ রায়চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ ডাঃ সুর্যকান্ত মিশ্র, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ তরুণ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, সহঃ সভাপতি—পরেশ পাল, সুব্রত ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—অজিত দত্ত, সহ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, সৌমেন চ্যাটার্জী, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, দপ্তর সম্পাদক—প্রবীর ঘোষ, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, হিসাব রক্ষক—প্রণব দত্ত, সদস্যগণ—সুভাষ শিকারী, মৃণাল চক্রবর্তী, প্রবীর ব্যানার্জীও অর্ণব সাহা, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদসগ্যণ—দীপক সেনগুপ্ত, মোশারফ হোসেন, বিমল পালচৌধুরী, পার্থসারথি মুখার্জী, অলোক গুপ্ত।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। অলোক গুপ্ত—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা ২। পার্থ মুখার্জী-হাওড়া-হুগলী-নদীয়া ৩। দেবেন মাহাতো—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-তমলুক-মেদিনীপুর, ৪। রবিউল ইসলাম—বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদ, ৫। কাদের

হোসেন—মালদহ-উত্তর দিনাজপুর, ৬। সুনীল বর্মণ—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার।

৭ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ১৩-১৫ই আগস্ট, ২০০০ সিউড়ি ডি.আর.ডি.এ. হল, বীরভূম

উদ্বোধকঃ সুশীল ব্রহ্ম, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ অজয় মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, সহঃ সভাপতি—সুব্রত ব্যানার্জী, অসীম ব্যানার্জী, সাদারণ সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—অজিত দত্ত, সহ-সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, অর্ণব সাহা, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, হিসাব রক্ষক—অসিত কুমার দাস, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, সদস্য—বিশ্বজিৎ বসু, সমীরণ রায়চৌধুরী, পরিচয় ভট্টাচার্য, ইরশাদ আলি। স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—দীপক সেনগুপ্ত, পার্থসারথী মুখার্জী, অলোকগুপ্ত, সমীরকুমার বসু, প্রণব দত্ত, মৃণাল চক্রবর্তী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। অলোক গুপ্ত—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা-উত্তর ২৪ পরগনা ২। সমীর বসু-হাওড়া-হুগলী-নদীয়া, ৩। দেবেন মাহাতো-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-তমলুক-মেদিনীপুর ৪। রবিউল ইসলাম-বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদ ৫। কাদের হোসেন—মালদহ-উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার।

৮ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১০-১১ই মে,২০০২ রবীন্দ্রভবন (অমল বিকাশ দত্ত মঞ্চ) কোচবিহার।

উদ্বোধক ঃ জ্যোতিপ্রাসাদ বসু, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ তরুণ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া, পর্যটন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, সহঃ সভাপতি—সুব্রত ব্যানার্জী, দেবেন মাহাতো, অসীম ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—অজিত দত্ত, সহ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, অর্ণব সাহা, কোষাধ্যক্ষ—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, দপ্তর সম্পাদক—অসিত কুমার দাস, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, হিসাব রক্ষক—অশোক কুমার দেবনাথ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য—পরিচয় ভট্টাচার্য, ঈর্শাদ আলি, বিশ্বজিৎ বসু, সমীরণ রায়চৌধুরী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দীপক সেনগুপ্ত, অলোক গুপ্ত, সোমনাথ ব্যানার্জী, পার্থসারথী মুখার্জী

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। মৃণাল চক্রবর্তী—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা-হাওড়া-হুগলী। ২। ধনঞ্জয় বিশ্বাস—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৩ কার্তিক ঘোষাল-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া। ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম ৫। মহম্মদ আলাউদ্দিন—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার ৭। সুভাষ বেরা—মালদহ-মুর্শিদাবাদ ৮। নিতাই সামন্ত—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর।

৯ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২৩-২৫ শে জানুয়ারী, ২০০৪ সরশুনা কলেজ, বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

উদ্বোধক ঃ সুশীল ব্রহ্ম, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ অজয় মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি , সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—সুব্রত ব্যানার্জী, সহ-সভাপতি—অসীম ব্যানার্জী, ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সমীর বসু, সাধারণ সম্পাদক—অজিত কুমার দত্ত, যুগ্ম-সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, সহ-সম্পাদক—অর্ণব সাহা, বিশ্বজিৎ বসু, দপ্তর সম্পাদক—অসিত কুমার দাস, কোষাধ্যক্ষ—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, হিসাব রক্ষক—বিমলেন্দ্রনাথ মহলানবীশ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য—পরিচয় ভট্টাচার্য, সমীরণ রায়চৌধুরী, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, শান্তা দত্ত, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দীপক সেনগুপ্ত, অলোক গুপ্ত, সোমনাথ ব্যানার্জী, নিমাইপ্রসাদ মুখার্জী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। হরিমোহন ব্যানার্জী—কলকাতা-হাওড়া-হুগলী-দঃ ২৪ পরগনা। ২। ধনঞ্জয় বিশ্বাস—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৩। কার্তিক ঘোষাল—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম ৫। নিখিলসুন্দর চক্রবর্তী—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর। ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার ৭। অশোক দেবনাথ—মালদহ-মুর্শিদাবাদ ৮। নিতাই সামন্ত—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর

১০ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ১০-১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ **কম্ সোমনাথ বন্দ্যোপাধায় মঞ্চ,** শরৎ সদন, হাওড়া।

উদ্বোধক ঃ জ্যোতিপ্রসাদ বসু, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ অশোক চক্রবর্তী, সহযোগী সম্পাদক, 'সংগ্রামী হাতিয়ার' ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশেষ অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক---অজিত কুমার দত্ত, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়---অরিন্দম বক্সী, বিশ্বজিৎ বসু,

সহ-সম্পাদকদ্বয়—অসিত কুমার দাস ও পরিচয় ভট্টাচার্য, দপ্তর সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, কোষাধ্যক্ষ—অশোক দেবনাথ, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, হিসাব রক্ষক—সুমিতরঞ্জন মুখার্জী, সম্পাদকমমন্ডলীর সদস্য—শান্তা দত্ত, দিব্যসুন্দর ঘোষ, শোভন চক্রবর্তী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অলোক গুপ্ত, নিমাইপ্রসাদ মুখার্জী ঈর্শান আলি, তপন মণ্ডল।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সমীর ভট্টাচার্য—কলকাতা-হাওড়া-হুগলী-দঃ ২৪ পরগণা। ২। বাসুদেব রায়—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৩। কার্তিক ঘোষাল—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম ৫। সমীরণ রায়চৌধুরী—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর। ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার ৭। মহম্মদ আলাউদ্দিন—মালদহ-মুর্শিদাবাদ ৮। তাপসরঞ্জন মিত্র—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর

একাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২২-২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৮, টাউনহল, মালদা

উদ্বোধক ঃ অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ জ্যোতিপ্রসাদ বসু, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশেষ অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—যোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক---অজিত কুমার দত্ত, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়---অরিন্দম বক্সী, বিশ্বজিৎ বসু, সহ-সম্পাদক—অসিত কুমার দাস ও দিব্যসুন্দর ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ—অশোক দেবনাথ, হিসাব রক্ষক—ওয়াহিদ আনোয়ার খান, দপ্তর সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য—শ্রীমতী শান্তা দত্ত, তপন মন্ডল, অর্ণব সাহা, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অলোক কুমার গুপ্ত, ঈর্শাদ আলি, পরিচয় ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর গাঙ্গুলী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সুনীত ব্যানার্জী—কলকাতা-দার্জিলিং-কোচবিহার। ২। সৌমেন ঘোষ—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর। ৩। সুদীপ্ত ভট্টাচার্য—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। সঞ্চিত ব্যানার্জী–বর্ধমান-বীরভূম ৫। কার্তিক ঘোষাল---বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। প্রভাস বিশ্বাস---নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা ৭। বাসুদেব রায়—কলকাতা-হুগলী-হাওড়া-দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ৮। অসিত সামন্ত—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর।

দ্বাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১৩-১৫ই মার্চ, ২০১০, রবীন্দ্রভবন, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

উদ্বোধক ঃ সমীর ভট্টাচার্য, যুগ্ম আহ্বায়ক, ১২ই জুলাই কমিটি এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ প্রবীর মুখার্জী, সহকারী সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, সহ-সভাপতি—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, অজিত কুমার দত্ত, অসিত কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, যুগ্ম-সম্পাদক—বিশ্বজিৎ বসু, প্রণব দত্ত, সহ-সম্পাদক—দিব্যসুন্দর ঘোষ, চঞ্চল সমাজদার, কোষাধ্যক্ষ—অশোক দেবনাথ, হিসাবরক্ষক—তপন মন্ডল, দপ্তরসম্পাদক—দীপঙ্কর গাঙ্গুলী, পত্রিকা সম্পাদক—অলোক গুপ্ত, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য—ওয়াহিদ আনোয়ার খান, আশিস গুপ্ত, সোমা গাঙ্গুলী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, ঈর্শাদ আলি, জরিতা দাস, আবদুল্লা জামাল।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। স্বপন পাত্র—জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-কোচবিহার ২। সৌমেন ঘোষ—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৩। সুব্রত চক্রবর্তী—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। সঞ্জিত ব্যানার্জী—বর্ধমান-বীরভূম ৫। কার্তিক ঘোষাল—বাঁকুড়া, পুরুলিয়া। ৬। প্রভাত বিশ্বাস—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা ৭। সৌমেন চট্টোপাধ্যায়—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৮। বাসুদেব রায়—হাওড়া-হুগলী ৯। অভিজিৎ ভুঁইঞা—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর।

ত্রয়োদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২৪-২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১২, মৌলালী যুব কেন্দ্র, কলিকাতা।

উদ্বোধক ঃ ডঃ প্রভাত দত্ত, শতবার্ষিকী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—অজিত দত্ত, সহ-সভাপতি—অশোক দেবনাথ, দীপঙ্কর গাঙ্গুলী, জরিতা দাস, সাধারণ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, যুগ্ম-সম্পাদক—বিশ্বজিৎ বসু, প্রণব দত্ত, সহ-সম্পাদক—দিব্যসুন্দর ঘোষ, শুভাশীষ মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ—মহঃ কালামউদ্দিন, হিসাব রক্ষক—আশিস গুপ্ত, পত্রিকা সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, দপ্তর সম্পাদক—কৃশানু দেব, সদস্য—সোমা গাঙ্গুলী, দীপঙ্কর মন্ডল, অম্লান দে, স্থায়ী আমন্ত্রিত—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, মনোরঞ্জন চেধুরী, দেবদাস ভট্টাচার্য, শিলাদিত্য ভট্টাচার্য, পুষ্পেন্দু সাহা।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। অয়ন চ্যাটার্জী—জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-কোচবিহার ২। মদন মন্ডল—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিন দিনাজপুর ৩। বিশ্বজিৎ মাইতি—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। দেবব্রত সাউ—বর্ধমান-বীরভূম ৫। অসিত দাস—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। রবীন্দ্রনাথ জানা—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর ৭। বাসুদেব রায়—হাওড়া-হুগলী ৮। সমীরণ রায়চৌধুরী—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৯। অসীম সাহা—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

চর্তুদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১৫-১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪, জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম হল, জলপাইগুড়ি।

উদ্বোধক ঃ **ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী,** অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সভাপতি—শ্রী প্রণব দত্ত, সহ সভাপতি—শ্রী অসিত দাস, শ্রীমতী জরিতা দাস, শ্রী সমর তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক—শ্রী চঞ্চল সমাজদার যুগ্ম সম্পাদক—শ্রী দিব্যসুন্দর ঘোষ, শ্রী শুভাশীষ মজুমদার, সহ সম্পাদক—শ্রী আশিস কুমার গুপ্ত, শ্রী কৌশিক ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ—শ্রী গৌতম সাঁতরা, হিসাব রক্ষক—শ্রী অম্লান দে, দপ্তর সম্পাদক—শ্রী বিশ্বজিত মাইতি, পত্রিকা সম্পাদক—শ্রী কৃশানু দেব, সদস্য—শ্রী অরিন্দম বক্সী, আব্দুল্লা জামাল, শ্রী সুদীপ সরকার, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—শ্রী মনোরঞ্জন চৌধুরী, শ্রী অজিত দত্ত, শ্রীমতী সোমা গাঙ্গুলী, শ্রী রূপবিলাস মন্ডল, শ্রী শুভাশীষ চক্রবর্তী।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

১। শ্রী নীলোৎপল চক্রবর্তী—জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-কোচবিহার ২। শ্রী মদন মন্ডল—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৩। শ্রী সঞ্জয় মুখার্জী—মালদা-মুর্শিদাবাদ। ৪। শ্রী সুশান্ত কুণ্ডু—বর্ধমান-বীরভূম ৫। শ্রী প্রিয়ব্রত রাঢ়ী—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। শ্রী পুষ্পেন্দু সাহা—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর ৭। শ্রী বাসুদেব রায়—হাওড়া-হুগলী ৮। শ্রী নিরঞ্জন গায়েন—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগনা ৯। শ্রী শিলাদিত্য ভট্টাচার্য্য—কলকাতা -দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

পঞ্চদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১৬-১৭ই জানুয়ারী, ২০১৬, মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা।

উদ্বোধক ঃ **অধ্যাপক সুবিমল সেন।**

সভাপতি—প্রণব দত্ত, সহ-সভাপতি—অসিত কুমার দাস, কৌশিক ভট্টাচার্য, সোমা গাঙ্গুলী, সাধারণ সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, যুগ্ম-সম্পাদক—দিব্যসুন্দর ঘোষ, শুভাশিস মজুমদার, সহ-সম্পাদক—আশিস গুপ্ত, সুদীপ সরকার, দপ্তর-সম্পাদক---বিশ্বজিৎ মাইতি, পত্রিকা-সম্পাদক---অম্লান দে, কোষাধ্যক্ষ—গৌতমকুমার সাঁতরা, হিসাবরক্ষক—শৈবাল মিত্র, সদস্য—অরিন্দম বক্সী, আব্দুল্লা জামাল, সুশান্ত কুণ্ডু, কৃশানু দেব, পুষ্পেন্দু সাহা, শুভ্রাংশু বসু; স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—মনোরঞ্জন চৌধুরী, অজিত দত্ত, বাসুদেব রায়, শিলাদিত্য ভট্টাচার্য, প্রণবেশ পুরকাইত, শান্তনু গাঙ্গুলী।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

১। শ্রী নীলোৎপল চক্রবর্তী—কোচবিহার-দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার ২। রাহুল ব্রহ্ম—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৩। শুভাশিস চক্রবর্তী—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। সুমন ঘোষ—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর ৫। কৌশিক সামন্ত—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। দেবব্রত সাউ—বীরভূম-বর্ধমান ৭। রজত চক্রবর্তী—হুগলী-হাওড়া ৮। বাসুদেব সরকার—উত্তর ২৪ পরগণা-নদীয়া ৯। নিরঞ্জন গায়েন—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন ঃ ২০-২১শে জানুয়ারি ২০১৮, মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা।

উদ্বোধক: নন্দিনী মুখার্জী, অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও অন্যান্য সদস্য

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—প্রণব দত্ত, সহ-সভাপতি—সোমা গাঙ্গুলি গৌতম সাঁতরা, শৈবাল মিত্র, সাধারণ সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, যুগ্ম-সম্পাদক—দিব্যসুন্দর ঘোষ, বিশ্বজিৎ মাইতি, সহ-সম্পাদক—আশিস গুপ্ত, শান্তনু গাঙ্গুলী, দপ্তর সম্পাদক—কৃশাণু দেব, পত্রিকা সম্পাদক—অম্লান দে, কোষাধ্যক্ষ— আবদুল্লা জামাল, হিসাবরক্ষক—অদিতি সর্বজ্ঞ, সদস্য—অরিন্দম বকসী, শুভাশীষ মজুমদার, গৌতম সর্দার, সুশান্ত কুণ্ডু, শুভ্রাংশু বসু, প্রণবেশ পুরকাইত, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অজিত দত্ত, অসিত দাস, বাসুদেব রায়, অনিমেষ ঘোষ, সুদীপ সরকার, মহঃ সইদ হাসান সিমন।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

১। দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার—নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ২। উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর—সুভাষ মোহান্ত, ৩। মালদা-মুর্শিদাবাদ—অসীম কুমার দাস, ৪। পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম—শঙ্কর নস্কর, ৫। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া—সুদীপ সোরেন, ৬। বীরভূম-বর্ধমান—কৌশিক পাত্র, ৭। হুগলী-হাওড়া—সুদেষ্ণা রায়, ৮। উত্তর ২৪ পরগণা-নদীয়া—শিবপ্রসাদ দাস, ৯। কলিকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা—নিরঞ্জন গায়েন।

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১১-১২ই জানুয়ারি, ২০২০, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি।
উদ্বোধক ঃ রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দিব্যসুন্দর ঘোষ, সহ-সভাপতি—গৌতমকুমার সাঁতরা, সোমা গাঙ্গুলী, দেবব্রত ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, যুগ্ম-সম্পাদক—আশিসকুমার গুপ্ত ও কৃশানু দেব, সহকারী সম্পাদক—শান্তনু গাঙ্গুলী ও শুভ্রাংশু বসু, কোষাধ্যক্ষ—আব্দুল্লা জামাল, দপ্তর-সম্পাদক—সুশান্ত কুণ্ডু, হিসাবরক্ষক—রিম্পা সাহা, পত্রিকা-সম্পাদক—অম্লান দে, সদস্যবৃন্দ—অরিন্দম বক্সী, প্রণব দত্ত, বিশ্বজিৎ মাইতি, অনিমেষ ঘোষ, মহঃ সঈদ হাসান, গৌতম সর্দার, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—বাসুদেব রায়, সুদীপ সরকার, প্রণবেশ পুরকাইত, সৌগত বিশ্বাস, দেবাংশু সরকার, শিবপ্রসাদ দাস।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও মালদা ও মুর্শিদাবাদ—শুভব্রত মিত্র, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম—কৌশিক পাত্র, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া—তারক হালদার, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম—কৌশিক সামন্ত, হাওড়া ও হুগলী—বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা—শুভ্রান্ত ঘটক, কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা—কৃশানু সেন।

Always use 'Devie' Brand Bricks

M/S DEVIE BRICK MFG WORKS

VILL & P.O. : DINGAKHOLA
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711314

S.G-2

Always use 'Gold' Brand Bricks

M/S GOLD BRICK WORKS

VILL :DHWAJA
P.O. : ALIPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711315

S.G-3

Always use 'Grand' Brand Bricks

M/S MITA BRICK WORKS

VILL : DHWAJA
P.O: ALIPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711315

S.G-4

Always use 'Hero' Brand Bricks

M/S Hero Brick Works

VILL :DHWAJA
P.O. : ALIPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST : HOWRAH
PIN : 711315

S.G-5

With Best Compliments from :

M/S SRIKRISHNA BRICK WORKS

VILL & P.O. : DINGAKHOLA
P.S. : SHYAMPUR
DIST : HOWRAH
PIN : 711314

S.G-6

With Best Compliments from :

M/S BHARATI BRICK

VILL & P.O. :DHWAJA
P.O. : ALIPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711315

S.G-7

Always use 'Rita' Brand Bricks

M/S J.S. ENTERPRISE

VILL : KAMALPUR,
P.O: RADHAPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711301

S.G-8

Always use 'RAJA' Brand Bricks

M/S Raja Brick Field

VILL : KAMALPUR
P.O. : RADHAPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST : HOWRAH
PIN : 711301

S.G-9

আধুনিক বাঙালি মননের ভগীরথ— অক্ষয় কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃশানু দেব

এক আশ্চর্য সমাপতন—একসঙ্গে ঘটেছিল দু'দেশে। জার্মানিতে জন্মেছিলেন দুজন প্রায় কাছাকাছি সময়ে। আজীবন তাঁরা ছিলেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সম ভাবনার শরিক এবং সামাজিক সংগ্রামে ছিলেন সহকর্মী। বলছি কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-৮৩) এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (১৮২০-৯৫) এর কথা। ভারতের মাটিতেও জন্মেছিলেন এমন দুজন মানুষ একেবারে সেই সময়েই (১৮২০) এবং তাঁরাও সারা জীবন পরস্পরের সহযোগী ছিলেন সমাজসংস্কার আন্দোলনে তথা নতুন ভাবনার ভাগীরথীতে। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২০-৯১) এবং অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬)। এই বছর তাঁদের জন্মদ্বিশতবার্ষিকী। খান কয়েক সেমিনার বা আলোচনাচক্র অথবা ঘটা করে গঙ্গাপুজোগোছের উদ্‌যাপন সেরে ফেলা যায় কিন্তু আমরা যারা বিভিন্ন কারণে তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁদের জীবন ও চরিত্র থেকে কিছু শেখার কথা ভাবি বা বলি, তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কেন এই শ্রদ্ধা এবং শেখার ইচ্ছা, তার সপক্ষে কিছু কথা বলা। অথচ আক্ষেপের কথা এই, বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আমরা বুঝে না বুঝে অনেক চর্চা করেছি কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্ত আমাদের বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্র থেকে প্রায় বাদ পড়ে গেছেন। শুধু যে তাঁকে বুঝিনি এমন নয়, বুঝবার চেষ্টাই করিনি। তাঁকেও যে বুঝতে হবে, এরকম ভাবনাই আমাদের মনে আসেনি

অথচ উনিশ শতকের নবজারণের সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষকরা জানেন, এই দুজনের জীবন-মননের বিচরণ ক্ষেত্র তথা আবর্তন তল ছিল অভিন্ন, একই উচ্চতায়। বিদ্যাসাগর যে বস্তুবাদী বিজ্ঞান ও দর্শনভিত্তিক চিন্তাধারার আলোয় সামাজিক সংস্কার-শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন করে গিয়েছেন, অক্ষয় দত্ত তাকেই প্রয়োগ করেছেন জ্ঞান-রাজ্যের নানা অলিগলিতে। আত্মমর্যাদাবোধ দুজনেরই ছিল প্রখর এবং অনমনীয়। এই একটি জায়গা ছাড়া দুজনেরই আর কোনও ব্যক্তিস্বার্থপরতা ছিল না। ব্যক্তিজীবনে নীতি ও আদর্শ মেনে চলার প্রশ্নে দুজনেই ছিলেন কঠোরভাবে আপসহীন। সেই যুগে বিদ্যাসাগরকে যদি কেউ সঠিক চিনে থাকেন, তবে সেই একমাত্র ব্যক্তিটি হলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। পাশাপাশি, অক্ষয় দত্তকে যদি সেই সময়ে কেউ সত্যিকারের অর্থে বুঝে থাকেন, তিনি অবশ্যই বিদ্যাসাগর। তাই আক্ষেপ বা আত্মসমালোচনা করে বলা যায়, আমরা যারা অক্ষয় দত্তকে নিয়ে ভাবিনি বা চর্চা করিনি, তারা আসলে বিদ্যাসাগর মশাইকেও চিনতে বা বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, আত্মসমালোচনাই এটা।

জ্ঞানে-মননে যাঁদের এত মিল, অথচ কী বিপুল তাঁদের বৈপরীত্য। ঈশ্বরচন্দ্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সর্বোচ্চ ধাপ

পেরিয়ে এসেছেন সসম্মানে। নানারকম উপাধি ও জলপানিতে ভূষিত হয়েছেন। করুন না করুন, ভালো ভালো চাকরি এবং পদমর্যাদা পেয়েছন জীবনে অনেক। অন্যদিকে, অক্ষয় দত্ত সাংসারিক দুর্বিপাকে স্কুলের গণ্ডিই পেরোতে পারেননি। অসময়ে তাঁকে চাকরি নিতে হয়। বিদ্যাসাগর চাকরি ছাড়াও বইপত্র লিখে দানধ্যান করার মতো প্রচুর অর্থ আপন যোগ্যতায় উপার্জন করতে পেরেছেন, আর অক্ষয় দত্তকে সারা জীবন দারিদ্র্য ও অর্থকষ্টের সঙ্গে লড়াই করে যেতে হয়েছে। কেননা, যে পথে গেলে পয়সা আসতে পারত, যেভাবে লিখলে অনায়াসে আরামে আয়াসে দিন কাটাতে পারতেন তা তিনি সচেতনভাবে বর্জন করে গেছেন। বিদ্যাসাগর কীভাবে সংস্কৃতি, শিক্ষা নিয়ে ভাবতেন তা জানতে পারা যায় তাঁর বিভিন্ন কার্যক্রম দেখে, তাঁর নানা পরিকল্পনা থেকে। নিজের বক্তব্য তিনি কোনও বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে প্রকাশ করে যাননি। যা লিখেছেন তার সবই কেজো বই, এখনকার ভাষায় প্রচারের প্যাম্ফলেট। তাঁর দার্শনিক মতামত আমরা সরাসরি জেনেছি সরকারি মহাফেজখানা থেকে তাঁর চিঠিপত্র উদ্ধার হওয়ার পর, তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক দশক পরে জানার চেষ্টা করা হয়েছে বলে। পক্ষান্তরে, অক্ষয় দত্ত তাঁর সমস্ত দার্শনিক মতামত নানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিলেন। সকলেরই তা পড়ার ও জানার সুযোগ ছিল। অথচ তা তাঁর উত্তর-প্রজন্মের প্রায় জানাই হয়নি। বইগুলি একে একে বইয়ের বাজার থেকে ফুরিয়ে গেছে। রাজ্যের কিছু কিছু পুরনো গ্রন্থাগারে আলমারিতে ঝুল-ধুলো-ময়লায় চাপা পড়ে গেছে। ধীরে ধীরে বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করে কীটজগতের খাদ্য সরবরাহ করেছে।

হয়ত এই সব কারণেই গত শতকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা বিদ্যাসাগরের স্মৃতি তর্পণ করেছেন, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পক্ষে অনেক দামি কথা বলেছেন বা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মেঘনাদ সাহা, রাজশেখর বসু প্রমুখ— তাঁরা প্রায় কেউই অক্ষয় কুমার দত্তের নাম বা তাঁর কোনও রচনার তেমন বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি। বিদ্যাসাগরের এই বন্ধুর নামটা কোনওরকমে টিকে গেলেও তাঁর কাজ সবই প্রায় স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। আমাদের এই বিশেষ ক্ষমতা, যা আসলে অন্য একটা কিছুর অক্ষমতা, তার উৎস কারণ ও শক্তি আমাদের আজ ভালো করে জানতে বুঝতে হবে।

দেশীয় জমিদারতন্ত্র (feudalism) এবং দেশি ও বিদেশি বেনিয়াপুঁজির (mercantile capitalism) আধিপত্যের দ্বন্দ্বের আবহে যে বুর্জোয়াশ্রেণীর উত্থান ঘটে বাংলায়, নবজাগরণে তাঁরাই ছিলেন প্রধান কারিগর। ঠিক এই সময়ে অখ্যাত অজ্ঞাত গাঁয়ের তথাকথিত অজ্ঞাতকুলশীল দুটি মানুষ একদিন কলকাতায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলে আসেন। একদিকে অক্ষয়কুমার উনিশ বছরবয়সে পিতার মৃত্যুতে অকালে স্কুলের পড়া অসমাপ্ত রেখে জীবিকার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে নিতান্ত ঘটনাচক্রে তখনকার বিখ্যাত কবি ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সেখানে মাঝে মাঝে কিছু কিছু গদ্য রচনা লেখা, অনুবাদ করা—এইরকম কাজ করতে করতে তিনি সমকালীন বিশিষ্ট মান্যব্যক্তিদের নজর আকর্ষণ করে ফেলেন। গুপ্ত কবির পরেই যিনি তাঁকে সঠিক মূল্যে চিনতে পারেন তিনি হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ভূগোল ও বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য তিনি অক্ষয়কুমারকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেন। ১৮৪০ সাল। এক মহাবৃক্ষ রোপণ। বুদ্ধিমুক্তির এক নতুন চারাগাছ। এক নতুন ইতিহাসের ভাবী স্রষ্টা বেছে নিলেন ভূগোল পঠনকে তাঁর 'বহুবিদ্যা' চর্চা সংক্রান্ত অন্বীক্ষার প্রথম ধাপ হিসাবে। বাংলা ভাষায় ভুগোল বই লেখা হল যা বাংলাভাষায় লেখা প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক বই (১৮৪১)। উপযুক্ত পরিভাষা চাই; তাও একে একে তৈরি করা হল। প্রতিটি কাজে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। রামমোহন রায় ধর্মীয় তত্ত্ব ও সামাজিক আচারমূলক প্রবন্ধ রচনার যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে অক্ষয় কুমার দত্তের মধ্যস্থতায় এক সম্পূর্ণ নতুন ধারা এসে যুক্ত হল। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, বাংলা

ভাষায় প্রবন্ধের সাহিত্য-ধর্ম রক্ষা করেও তিনি তার মধ্যে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করেছেন এবং সেই সূত্রেই সে যুগে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের তিনি ভবিষ্যত পথপ্রদর্শক।

অন্যদিকে বর্ণপরিচয় দিয়ে শুরু। সেকালের সবচাইতে পণ্ডিত মানুষটা বই লিখছেন সবচাইতে নিম্নশ্রেণির ছাত্রদের জন্য। বাংলা ভাষায় ডবল-ঋ ডবল-লি তুলে নিলেন। অন্তঃস্থ-র রাখলেন না, উচ্চারণে নেই বলে। বাঙালির উচ্চারণে লাগে বলে 'ড়' এবং 'ঢ়' চালু করলেন। অন্তঃস্থ-'য' আর অন্তঃস্থ-'য়' (ইয়)-দের উচ্চারণগত কারণে আলাদা করে দিলেন। সংস্কৃত দাপট মুক্ত বাংলা ব্যাকরণ হয়ে গেছে সহজ সরল। কেমন একটা বাংলা-বাংলা ভাব দিয়ে। এক আলতো টোকায় এইভাবে বাংলা সেদিন সংস্কৃত থেকে একটা পৃথক ভাষা হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল। অক্ষয় দত্তের অনুসরণে ব্যাকরণসম্মতভাবে কর্তা ক্রিয়া কর্ম ইত্যাদির স্থান নির্ধারণ ও নির্দেশ করে বাংলায় বাক্য গঠনের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সুষমা গড়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। সেটাই আজও চলছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ (বা তদানীন্তন আরও অনেকের) মতো কর্ছে, মর্ছে, ফির্ছে নয়, করছে, মরছে, ফিরছে লেখা চালু হল। সংস্কৃতের কঠিন শৃঙ্খল থেকে মুক্তিও তিনিই এনে দিয়েছেন। বাংলা গদ্য ভাষা বিবর্তনের রাস্তাটা তিনিই খুলে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর এবং রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন সেই সাধু ভাষাতেই গদ্য লিখলেও কথ্য ভাষায় বাংলা সাহিত্য-ব্যবহার শুরু হল বিশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই। গল্প উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব বয়ান যদি বা সাধু ভাষায় হয়ও, সংলাপগুলিতে কথ্য ভাষা জাঁকিয়ে বসে গেল। নাটকেও একই সময়ে কথ্য ভাষার ব্যবহার পুরোদমে চালু হল। তবু, যাঁরা অবাক হয়েছেন, যাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও বিদ্যাসাগর ঢুকে বসে আছেন। অত বড় এক অচলায়তন—তার দরজা ভাঙতে না পারলেও দেওয়ালে কিছু ফুটো তিনি করে দিয়ে গেছেন। সেই ফুটোগুলো মেরামতির অযোগ্য। ফলে কিছুটা হলেও বুদ্ধির প্রগতির মৌসুমী বায়ু ঢুকে গেছে কিছু মানুষের অন্তরে। হাতে এসে গেছে বাংলা অক্ষর।

এইভাবেই সেদিন বাংলা ভাষার যেন পুনর্জন্ম হল। এই আধুনিক রীতির গদ্য বাক-ধারা নির্মাণে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ইংরাজি লিখিত ভাষা থেকে বিভিন্ন যতিচিহ্ন আত্মসাৎ করে তাদের বাংলাভাষার কোলে-কাঁখে গুঁজে দেওয়া। পূর্ণচ্ছেদ যতিচিহ্ন হিসাবে দাঁড়ির ব্যবহার আগে থেকেই ছিল। সংস্কৃত শ্লোকের দুই দাড়ি বর্জন ও এক দাড়ি গ্রহণ করে বাকিগুলি, অর্থাৎ কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:), হাইফেন (-), ড্যাশ (—), প্রশ্নবোধক-চিহ্ন (?), বিস্ময়চিহ্ন (!), উহ্যবাচক ঊর্ধ্ব কমা ('), দুরকম উদ্ধৃতিচিহ্ন- (" এবং "), তিন রকমের বন্ধনী (() {} []), অনুক্তিবাচক বহুডট (...), প্রতীক ব্যবহার সহযোগে পাদটীকা, ইত্যাদি এমনভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন যে এগুলি যে লিখিত বাংলা ভাষার ভেতরে এক কালের আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথি, মাত্র কিছু দিন আগেও এদের অস্তিত্ব বা ব্যবহার বাংলা রচনায় ছিল না, তা বলে না দিলে আজ আর বোঝার কোনও উপায় নেই।

দুঃখের বিষয়, এইক্ষেত্রে অক্ষয় দত্তের অবদান বাঙালি বুদ্ধিজীবী মননে স্বনামে এবং সহজে প্রবেশাধিকার পায়নি। কৃতিত্বটি বিদ্যাসাগরের নামে হাত-বদল হয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের, এই হাত-বদলের ঘটনাটি ঘটেছে স্বয়ং কবিগুরুর জ্ঞাতসারে—তিনি বিভিন্ন সভায় বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বাংলাভাষায় ছেদচিহ্ন প্রবর্তনের কৃতিত্ব তাঁর নামে বলতে থাকেন। ফলে সহজেই এই কথা সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি বিদ্বজ্জনদের মনের মধ্যেই স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেয়। কেবলমাত্র অতি সম্প্রতি কিছু পরিশ্রম সাধ্য গবেষণা সঠিক তথ্য উদ্ধার করে অক্ষয় কুমার দত্তকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে বিদ্যাসাগর প্রথম এই ধরনের সুসংগঠিত বাংলায় লেখেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (বাংলা ভাষায়

প্রথম গল্পের বই), যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। পক্ষান্তরে, অক্ষয় দত্তের ১৮৪১ সালের 'ভূগোল' গ্রন্থেই আধুনিক যতি চিহ্নের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাংলা গদ্য ভাষার সংস্কার অবশ্য শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। এই ব্যাপারে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের কথা যেমন বলতে হবে, তেমনই রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের কথাও স্মরণ করতে হবে। বিদ্যাসাগরের প্রায় সমকালেই, সম্ভবত কিছু কাল আগেই—১৮৪০-এর দশকে অক্ষয় কুমার দত্ত এবং ১৮৫০-এর দশকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলায় প্রবন্ধ ও পাঠ্যপুস্তক লেখার কাজ শুরু করেছিলেন। তবে বাংলা গদ্যে (দাঁড়ি বাদে) ইউরোপীয় সমস্ত যতিচিহ্নের গৃহপ্রবেশের মূল হোতা অক্ষয় কুমার দত্ত হলেও, বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা নির্মাণের প্রথম পেশাদার বাস্তুকার ছিলেন।

অক্ষয় দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠশালা ও পরে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ দুজন মানুষকে দুদিক থেকে উপকৃত করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছিলেন একজন অত্যন্ত উপযুক্ত এবং নিষ্ঠাবান কাজের মানুষ, যাঁর বিদ্যাবুদ্ধির কাঁধে ভর দিয়ে তাঁর পাঠশালা এবং পত্রিকা দুটোই বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অন্য দিকে, অক্ষয় দত্তের সুবিধা হয়েছিল এই যে তিনি তাঁর কর্মজীবনের শুরুতেই মনের মতো কাজ করার একটা ভালো জায়গা পেয়ে গিয়েছিলেন (আমাদের সৌভাগ্য, সেদিন রোজগারের তাগিদে, বন্ধুস্থানীয়দের পরামর্শে অক্ষয় দত্ত দারোগা বা মোক্তার হয়ে যাননি।) যদিও অচিরেই দুজনের পক্ষে পরস্পরকে মেনে নিয়ে একে অপরের সঙ্গে কাজ করা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ও উৎসাহে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং রামমোহনের চিন্তার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হন। সেই ধ্যান ধারণায় ইউরোপের প্রাচীন দর্শন সাহিত্য ইতিহাস পড়তে গিয়ে তিনি ক্রমশ বুঝতে থাকেন যে পৌত্তলিকতা (idolatry) এবং বহুদেববাদ (polytheism) আসলে একটি অত্যন্ত প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস। ধর্মকে ইতিহাসের আধারে দেখবার ফলে এবং বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করার ফলে তিনি ধীরে ধীরে একটা সময়ে ধর্মবিশ্বাসকেই পরিত্যাগ করে বসেন। ব্রাহ্ম থেকে প্রথমে সংশয়বাদী হয়ে অবশেষে তিনি একদিন সম্পূর্ণ বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদীতে পরিণত হন। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তরোত্তর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর ভক্তিবাদী অনুগামীদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি যখন তত্ত্ববোধিনীর পাতায় 'ধর্মনীতি' এবং 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ' বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখছিলেন, তখন থেকেই এই মতবাদিক দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। কেননা, ব্রাহ্মসমাজের আলোচনায় যখন সাকার-নিরাকার পূজার তুল্যমূল্য বিচার চলত, ঈশ্বরকে বাতাসা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে বাদানুবাদ হত, সেইরকম সময়ে, ১৮৪৯ সালে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মধর্ম' শীর্ষক বই প্রকাশিত হয়। এতে তিনি শুদ্ধ মনে ঈশ্বরের কাছে অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করলে ঈপ্সিত ফল লাভ হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। সেই সময় একদিন হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্র অক্ষয় কুমার দত্তের কাছে প্রার্থনার কার্যকারিতা বিষয়ে প্রশ্ন করে বসে। তিনি বেশি আলোচনায় গেলেন না। দুটো সরল সমীকরণ লিখে সমাধান করলেন :

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম + শস্য = শস্য

প্রার্থনা = ০

অর্থাৎ, তাঁর মতে, প্রার্থনায় কোনও ফল নেই। শস্য উৎপাদন করতে হলে পরিশ্রম করতেই হবে। তার সঙ্গে প্রার্থনা কেউ চাইলে করতেই পারে। কিন্তু প্রার্থনা না করলে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যাবে, প্রার্থনা করলেও সেই

সমপরিমাণই ফসল ফলবে। লক্ষ্যনীয়, ধাক্কাটা আসলে কোথায় গিয়ে পড়ছে। কালীপূজা ভূমিপূজা বাস্তুপূজা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সমীকরণটি প্রযোজ্য হলে (কেননা, সেসব ক্ষেত্রেও একইভাবে এটা প্রয়োগ করা যেতে পারে) হিন্দুদের পৌত্তলিক বিশ্বাসের গায়ে ফোস্কা পড়লেও ব্রাহ্মদের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় কিছুই বলার ছিল না। কিন্তু, এ তো তা নয়। প্রার্থনা তো ব্রাহ্মরাও করছে। অতএব এইরকম কঠোর বৈজ্ঞানিক যুক্তির অভিঘাত অনেক বেশি লাগছে ব্রাহ্মধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের ভিত্তিমূলে। এই মতবিরোধ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায় যখন বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সপক্ষে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মতবাদিক চর্চা শুরু করেন (১৮৫৪)। অক্ষয় দত্ত এই সময় বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলনের এই কার্যক্রমের পক্ষে দাঁড়িয়ে কলম ধরতে চান, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাতে রাজি নন। তিনি বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের পক্ষে থাকলেও ধর্মসংস্কারের এইসব প্রচেষ্টার বিরোধী। পত্রিকার কর্তৃত্ব দেবেন্দ্রনাথের হাতে থাকা সত্ত্বেও অক্ষয় দত্ত এই ধরনের একটি লেখা ১৮৫৪ সালে প্রকাশ করেন তত্ত্ববোধিনীর পাতায় এবং তাতে শুধু যুক্তি নয়, তাঁর স্বাভাবিক লেখনীর গতিমুখ খানিকটা পরিবর্তন করে প্রবল আবেগ সহকারে তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে নারী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হয়ে বিদ্যাসাগর স্কুল ইন্সপেক্টর থাকার সময় ছোটলাট হ্যালিডের মৌখিক প্রস্তাবেই বাংলায় শতাধিক মেয়েকে নিয়ে স্কুল খুলে ফেলেন, জন এলিয়ট বিটনকে সহযোগিতা করছেন দেশে মেয়েদের জন্য প্রথম স্থায়ী স্কুল খোলার উদ্যোগে (১৮৪৯)। কি চমৎকার যুগলবন্দি।

পশ্চিমী রেনেশাঁসের যুক্তিবাদী মনোভাবকে তাঁরা এতটাই আত্মস্থ করেছিলেন যে, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে শুধুমাত্র অনুসরণ করে চলতেন তাই নয় সমস্ত আচারবিচার কুসংস্কার কুপ্রথার প্রশ্নে হচ্ছিলেন নির্দ্বিধায় আপসহীন। এরকম উদাহরণ আমাদের দেশে তো বটেই, এমনকি রেনেশাঁসের আঁতুরঘর ইউরোপেও খুব বেশি সংখ্যায় নেই। কেউ ধর্ম মেনে চলেন কিন্তু আচারবিচার মানেন না; কেউ হয়ত ভগবানে বিশ্বাস করেন না কিন্তু ভূত-প্রেতের ব্যাপারে ভয় পান। অনেকের প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে হয়ত আস্থা নেই, কিন্তু তারা কোনও এক দূরাসীন দার্শনিক আত্মভোলা নিকম্মা ভগবানে বিশ্বাস করেন। এইভাবে তারা অনেকেই জীবনের নানা কোণায় গলিখুঁজিতে বিভিন্ন মাত্রার আপস করে চলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই অক্ষয়কুমার দত্তকে সেসময় আক্রমণ করে লিখতে এবং বলতে থাকেন। এর কারণ হলো এই সময়কালে তিনি যে বইগুলি লিখেছিলেন তাদের বিষয়বস্তু। তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ভূগোল বইটি ছাড়াও দার্শনিক গুরুতর চিন্তার প্রকাশ হিসাবে অবশ্য তাঁর প্রথম বই **'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার'**-এটি যদিও একেবারে মৌলিক রচনা নয়। স্কটল্যাণ্ডের বিজ্ঞান লেখক জর্জ কুম্ব-এর লেখা Essay on Constitution of Man and Its Relation to External Object বইটির প্রায় একরকম ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। স্কটিশ লেখক যেভাবে ভৌতবস্তুর সঙ্গে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা চালিয়েছেন, অক্ষয় দত্তও সেই জিনিসটিই ভারতীয় নৈমিত্তিক জীবনের আবহ থেকে এদেশের পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক সত্তার প্রতিপাদ্যটি উপস্থাপন—জগৎ সংসারের সমস্ত ঘটনার পেছনে সদাসক্রিয় ঈশ্বর নয়, একটা সাধারণ জাগতিক কার্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান। এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর তিন খণ্ডে 'চারুপাঠ'। এই বইয়ের খণ্ডগুলিতে তিনি আগ্নেয়গিরি, সিন্ধুঘোটক, জলপ্রপাত, হিমশিলা, মুদ্রাযন্ত্র, ব্যোমযান, বর্ষণবৃক্ষ, দিগদর্শন, প্রবাল, আলেয়া, সৌরজগত, ধূমকেতু, তাপমান, পতঙ্গভুক বৃক্ষ, ভূগর্ভস্থ হ্রদ ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, লক্ষ্য ছিল সহজসরল ভাষায় সমকালীন প্রচলিত নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা ও মতবাদগুলি থেকে মুক্ত করে কোমলমতি ছাত্রদের মধ্যে সঠিক ধারণা ও জ্ঞানের স্পর্শ দেওয়া।

এতসবের পাশাপাশিও দেখা যাচ্ছে যে সময় পেলেই তিনি চিনি, ময়দা, সুতার কল, কাগজের কল, টাঁকশালে যাচ্ছেন যন্ত্রবিজ্ঞান কী ভাবে কাজ করে দেখবেন বলে। এমনকি সমুদ্রভ্রমণে গিয়ে দূরবিন চোখে পৃথিবীর গোলাকৃতির পরীক্ষা করতেন, জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলোচনা করতেন নানা দেশ নিয়ে। কী উদ্যম, অধ্যবসায়।

শিক্ষার অভাবজনিত কুসংস্কার সমূহের সর্বব্যাপী প্রভাব ও প্রকাশকে অক্ষয়কুমার শুধু বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির দিক থেকেই সমালোচনা করেননি, তাকে যথার্থ সুখের অপ্রাপ্তি হিসাবেও চিহ্নিত করে গেছেন। জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষই যে সত্যিকারের অর্থে মানুষ, এবং সুখী মানুষ—অক্ষয় দত্তের এ এক অসাধারণ উপলব্ধি এবং শিক্ষা। এই বোধের বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় প্রকাশ করেছেন 'বিদ্যাদর্শন' নামে মাসিক পত্রিকা।

অন্যদিকে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন স্থির করলেন ছাত্রদের জন্য প্রাচীন টুলো শিক্ষা নয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানবতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করতে হবে, ভাষা সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান অঙ্ক শেখাতে হবে, ধরাবাঁধা আনুষ্ঠানিক নিয়মানুগ পদ্ধতিতে শেখাতে হবে, ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়পক্ষকে ঘড়ি-ঘণ্টা মেনে শিক্ষায়তনে এবং শ্রেণিকক্ষে ঢুকতে হবে, পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে, তখন তিনি সংস্কৃত কলেজে এবং পরে মেট্রোপলিটান স্কুলে সেটা প্রয়োগ করে দেখালেন। যে সমস্ত শিক্ষকরা বয়সের দোহাই দিয়ে দেরি করে কলেজে ঢুকতেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদেরও ফটকের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে লজ্জা দিয়েছেন। অনেকেই সেই কারণে নরেন দত্তকে মেট্রোপলিটান স্কুলের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ঘটনাটা ক্ষমা করে উঠতে পারেননি। অথচ, নরেন স্যার ক্লাসে নিয়মিত আসবেন না, এলেও ছাত্রদের কাছে দক্ষিণেশ্বরের কালীসাধকের গল্প বলে সময় খরচ করবেন—এটা তাঁর আক্ষরিক অর্থেই না-পসন্দ ছিল। আমরাও আজকে কোনও স্কুলে এরকম শিক্ষকের দেখা পেলে অপছন্দই ব্যক্ত করি, শিক্ষকদের জাত তুলেও গাল পাড়ি, কিন্তু তাই বলে নরেন দত্তর বেলায় একই নিয়ম খাটানো যায় নাকি? 'জানেন, তিনি শেষ পর্যন্ত কে হবেন? কী করবেন?' না, ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র দুই বছরের জন্য তা' জেনে যেতে পারেননি। যেটুকু জেনেছিলেন, তাতেই অবশ্য তিনি কী চান বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। ইস্কুল মানে যে ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতি করে গল্প করার জায়গা নয়, তিনি সেদিন এটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রায় এই সময়েই অক্ষয় দত্ত, লেখেন আরও দুখানা বই—ধর্মনীতি এবং পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬)। এরও প্রথমটি কুম্ব-এর বই Moral Philosophy অনুসরণ করে লেখা। দ্বিতীয়টিও ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানের বই থেকে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ তুলে তুলে অনুবাদ করে নিজের ভাষায় ও ঢঙে রচিত—বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক। কিন্তু দুটি বইয়েরই উদ্দেশ্য অভিন্ন। বস্তুজগত সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে একটা ন্যূনতম জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া, ধর্মের নামে বা নৈতিকতার নামে প্রচলিত দেশাচার কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরোধিতা করে সরল স্বাভাবিক সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ে তোলা এবং সমাজের হিতের জন্য জীবন অতিবাহিত করাকে সু-উচ্চ নৈতিকতা হিসাবে তুলে ধরা। একদিকে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লিখেছেন, অপরদিকে বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের সপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তখনও তাঁর হয়ত ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তা তখন দ্রুত বিলীয়মান। বহুপ্রচলিত বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে একজন প্রকৃত যুক্তিবাদীর মতো তিনি নীতিবোধ (morality) -কেও ধর্ম থেকে আলাদা করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি তখন বিভিন্ন সভায় বলে বেড়াতেন,—'ভাস্কর ও আর্যভট্ট এবং নিউটন লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র, গৌতম ও কণাদ এবং বেকন প্রমুখ যে প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন

তাহাও আমাদের শাস্ত্র।' নামগুলো লক্ষ করার মতো। যাজ্ঞবাল্ক্য, বশিষ্ঠ, মনু, পরাশর, কুল্লুকভট্ট, শঙ্কর রামানুজ—ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অধ্যাত্মরসশ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিদের নাম অক্ষয় দত্তের আচার্য তালিকায় ঢোকার ছাড়পত্র পায়নি। একইরকমভাবে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর 'জীবনরচিত' বইয়ে গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, নিউটন প্রমুখের জীবনযুদ্ধের কথা লিখলেন, 'বোধোদয়' বইতে তিনি ঈশ্বরের কোনো উল্লেখই করলেন না—মিশনারী গুরুঠাকুররাও গেলেন চটে (এর প্রতিক্রিয়ায় সরকারী তরফে 'বোধোদয়' এর প্রকাশনা বন্ধ করার প্রক্রিয়া চালু হলে একরকম বাধ্য হয়েই 'বোধোদয়'-এর তৃতীয় সংস্করণে 'ভগবান' প্রসঙ্গের নামমাত্র অবতারণা করেন)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক ধর্মনিরপেক্ষ এই যুগলের দায়িত্বশীল প্রয়াস ফুটে উঠেছিল।

সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই মানুষদের জ্ঞানচর্চার প্রাবল্য ও অভিমুখ ভক্তিমার্গীয় বিশ্বাস ও আচরণের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত হবে। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ ছিল না। আজীবন বন্ধুত্ব ছিল তাঁদের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনারায়ণ দীর্ঘালালিত অন্ধ বিশ্বাসে আঘাত পড়ায় তাঁর ভেতরের অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি। এই বিরোধিতা অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর পরেও বজায় ছিল। মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধির লেখা অক্ষয়কুমার দত্তের প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থে ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করায় এবং তাঁর আসন একটু উঁচুতে রাখায় ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

অন্যদিকে সেকালের একজন অসাধারণ বিদ্বান ব্যক্তি হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র কথা এতই কম বলতেন এবং লিখতেন—জ্ঞানগর্ভ কথা তো প্রায় বলেনইনি কোথাও—যার ফলে আমাদের কোনও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখার সময় তার ভেতরে গুঁজে দেওয়ার জন্য উদ্ধৃতিযোগ্য বাক্য (যাকে বাংলায় বলে কোটেশন) পাওয়া খুব কঠিন। আর যা কিছু বলেছেন (বা লিখেছেন) তা একেবারে একশো শতাংশ সত্য ও তথ্যে ঠাসা। নিশ্চিত বিবৃতি। যে কোনও বই খুলে দেখুন। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, উপর থেকে নীচে—যেদিকে খুশি যান, দেখবেন, 'তবে', 'যদিও', 'কিন্তু', 'তাই নাকি', 'মানে', 'দেখি', 'হয়ত', 'দেখা যাবে', 'চেষ্টা করব',..., এরকম পলাতকী অব্যয় (অথবা দ্বিধাজনিত বা কুণ্ঠাজড়িত তোতলামি) ঢোকানোর জায়গা কোথাও রাখেননি। বিদ্যাসাগর-বিরোধী একাধিক মহল আছে, যারা উপযুক্ত সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠে নানা যুক্তিটুক্তি তুলে তাঁর সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনেক গুরুত্বহীন করে দেখাতে থাকেন। বর্তমানে যে ভূমিকা নিচ্ছে ধর্মীয়-মৌলবাদী তথা ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলির শাখাপ্রশাখাগুলো। বিদ্যাসাগর ওদের কাছে ভারি সমস্যার। শুধু এই জন্য নয় যে তিনি হিন্দু বিধবাবিবাহের আইনি আয়োজন প্রস্তুত করেছিলেন। বাল্যবিবাহ তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। বাল্যবিবাহের পরিণতিতে যে বালবিধবা জন্মায়, তার সর্বাত্মক দুঃখজনক পরিণতিতে তিনি নিদারুণ ব্যথা অনুভব করতেন। ওর মধ্যে সৌন্দর্য দেখতে পাওয়ার মতো নান্দনিক চোখ তাঁর ছিল না। তাই সেই সত্য পালন। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সহবাস সম্মতি আইনকে শাস্ত্রের বাইরে শারীরবৃত্তীয় বিচারে টেনে আনার চেষ্টা করেছিলেন। এগুলো তো আছেই। এর উপরে আছে তাঁর দুটো লিখিত উক্তি। যা তাঁর জীবনকাল শেষ হওয়ার অনেক পরে (১৯২৬ সাল নাগাদ) আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্তি তো নয়, যেন দুটো টাইম বোমা!—(১) *'The Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy, is no more a matter of dispute. [Letter to F. J. Mouat—বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র]* এবং (২) ইংরেজরা জানতে চেয়েছিল, ভারতীয় দর্শনের কিছু বই কি ইংরেজিতে অনুবাদ করে পড়ানো যায় না? বিদ্যাসাগরের সাফ সাফ উত্তর, *'...there is nothing substantial in them... '* / [*বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র*] —অর্থাৎ যেন বলতে চেয়েছেন—আরে মশাই, ওগুলো শুধু দুর্বোধ্য মনে হয় বলে

অনুবাদ করা যাবে না—এমন নয়। আসলে কী জানেন, অনুবাদ করার জন্য কিছু মাল মশলা থাকার দরকার হয়। ওগুলোতে সেরকম কিছু নেই। এই সব কথা বলার জন্য দেশের পেছন-তাকানো বেদপন্থী সনাতনপন্থীরা বিদ্যাসাগরকে কোনও দিনই ক্ষমা করতে পারছে না। যে বেদান্ত নিয়ে বিবেকানন্দের অত উদাত্ত আহ্বান, যে সাংখ্য বেদান্তকে দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানের শিরোমণি বলে কত পণ্ডিতের কত আস্ফালন, অত বড় একজন সংস্কৃতবিদ এরকম বলেছেন জানার পর তার আর কোনও ইজ্জত থাকে? মানচিত্রে থাকলে তাঁকে সেদিনই পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিত ওরা।

যেসব আর্থসামাজিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে ইউরোপে চিন্তায় মননে পার্থিবতা ও মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটেছিল, ঔপনিবেশিক ভারতে তা অনুপস্থিত ছিল। বিবিধ কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকগুলোতে বাংলার হিন্দুসমাজ পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের পুনর্জাগরণের উর্বরভূমি হয়ে উঠেছিল। এ কারণে বিদ্যাসাগরের আধুনিকতাকে তৎকালীন বঙ্গসমাজ ধারণ করতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের দয়া-দাক্ষিণ্য, মাতৃভক্তি সেই সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল বলেই করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের কদর হয়েছে, আধুনিক বিদ্যাসাগরের হয়নি।

মানতে হবে, বিদ্যাসাগর প্রায় কোনও আন্দোলনেই সফল হননি। বাস্তব ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। বিদ্যাসাগরকে অনেকেই—তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্ম এবং উচ্চশিক্ষিত হিন্দু, দুপক্ষেরই লোক ছিলেন—কথা দিয়েছিলেন, বিধবাবিবাহের আন্দোলনে এবং কিছু কিছু পরিচিত বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রচেষ্টায় টাকাপয়সা দিয়ে এবং অন্য নানাভাবে সাহায্য করবেন। কাজে নেমে ঈশ্বরচন্দ্র দেখলেন, তাদের আর টিকিটিও নজরে আসছে না। 'সোমপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত (৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪) একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে প্রায় ৬০টি বিধবাবিবাহ দিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রায় ৩৫০০০ টাকার ঋণ হয়েছিল। এই অবস্থায় সুহৃদ প্যারীচরণ সরকার আর্থিক সাহায্যের আশায় গেলেন কলকাতার অন্যতম ধনী পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের কাছে এবং যথারীতি খালি হাতেই তাঁকে ফিরতে হল। এর পর ১৮৬৭তেই বিদ্যাসাগরের জন্য একটি ফান্ড তৈরির চেষ্টায় জল ঢাললেন বিদ্যাসাগর নিজেই। তিনি লিখিত ভাবে জনসাধারণকে জানালেন যে তাঁর ব্যক্তিগত ঋণ শোধ করার জন্য ফান্ড তৈরি করার কোনও প্রয়োজন নেই। ফান্ডের টাকা কেবলমাত্র আগামী দিনের বিধবাবিবাহের জন্যই খরচা করতে হবে। বিদ্যাসাগর পরে লিখেছিলেন, 'অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন।... যাহা হউক আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব' ('বিদ্যাসাগর'—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। সেই সময়ের 'নব্যভারত' পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে বিধবাদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে আর্থিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত বিদ্যাসাগরকে বিধবাদের আশ্রয় দেওয়ার 'অপরাধ'-এ শিক্ষিত বাঙালির কাছ থেকে সে দিন 'চরিত্রহীন' জাতীয় গালমন্দও শুনতে হয়েছিল। একথা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের সমান্তরালে বিধবা বিবাহ জনপ্রিয় হয়নি। সম্ভবত কায়েমী স্বার্থের জন্যই। বেশ কয়েকজন (তৎকালীন) প্রগতিশীল বাতেলাবাজ লোক কোনও বিধবাকে বিয়ে করবে বলে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে হাত পেতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য নিয়েছে, অন্যান্য সুযোগসুবিধা আদায় করেছে, কিন্তু তারপরও কেউ কেউ বিয়ের সময় ঘনিয়ে এলে বাবা মা আত্মীয় পরিজনের দোহাই দিয়ে—অর্থাৎ, সমাজের নাম করে—পিছিয়ে গেছে। উঁহু, ঠিকই আন্দাজ করেছেন। তারা টাকাগুলো তাই বলে বিদ্যাসাগরকে ফেরত দেয়নি *(বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ—বিনয় ঘোষ)*। বিধবাবিবাহ আইন হলেও বৃহত্তর হিন্দুসমাজ একে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেনি। বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহও তিনি বন্ধ করাতে পারেননি। সংস্কার তো অনেক দূরের কথা। ঐতিহ্য লোকাচারের ধ্বজাধারীরা এককাট্টা হয়ে আটকে দিয়েছে। যে অন্তরঙ্গ বন্ধু বিধবাবিবাহে সর্বক্ষণ পাশে ছিলেন, তিনিও বহুবিবাহের প্রশ্নে পাশ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ঘটনাক্রমে বিবেকানন্দ এটিকে বিরাট কোন কাজ বলে

মনে করেন নি। তাঁর বক্তব্য ছিল বিধবারা বিয়ে করবে কিনা সেটা তারাই ঠিক করবে। 'বিধবা বিবাহ আন্দোলনে শতকরা সত্তর জন ভারতীয় নারীর কোনই স্বার্থ নেই।' (উদ্ধৃতির জন্য, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ : শঙ্করীপ্রসাদ বসু, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬২, কলকাতা, ১৯৮০)। শতকরা সত্তর জনের স্বার্থ নেই বলে উচ্চবর্ণের মধ্যে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন বিরাট কোন কাজ নয় বললে প্রকৃত সমস্যার অতি সরলীকরণ হয়—বিশেষ করে যখন আমরা জানি এই উচ্চশিক্ষিত উচ্চবর্ণের মানুষদেরই একাংশ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে নিজেদের নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রথম প্রয়োজন 'আত্মশুদ্ধি'। সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর সেই পথিকৃতের কাজটি করেছিলেন—তাঁর শ্রেণী ও সমাজই ছিল তাঁর প্রধান টার্গেট। একে কোনভাবেই লঘু করে দেখা যায় না। তবে একই সঙ্গে মৃত্যুর মাত্র দুদিন আগে তিনি যখন সিস্টার নিবেদিতাকে আলমোড়ায় বললেন, 'রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করেছি' (after Ramakrishna, I follow Vidyasagar') তখন সেটিকে ধরে নিতে হবে বিবেকানন্দের সতর্ক ও সচেতন উক্তি। খুব সম্ভবত এক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগরের স্বাজাত্যভিমানের কথাকেই স্মরণ করেছেন।

আজকাল অনেকে এই সব অপ-দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁর এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে খাটো করে দেখাতে চান। 'উৎকোচের বিনিময়ে সমাজ সংস্কার' বলে উপহাস করতে চান। সে তাঁরা করতেই পারেন। কেন না, তাঁদের তো কোনও কিছুর বিনিময়েই সমাজে কোনও বৃহতের সাধনা করতে হচ্ছে না। যাঁরা কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের ছিদ্র অন্বেষণ করেই প্রায় দিন কাটাতে হয় বা কাটালেও হয়।

এরকম আরও অনেক নীচতা ক্ষুদ্রতাকে প্রত্যক্ষ করেই তো রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বললেন যে ছোট জিনিসকে বড় দেখাবার যন্ত্র হিসাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিপরীতে আমরা যদি চারপাশের আপাত দৃষ্টিতে বড় জিনিসগুলিকে ছোট দেখাবার কোনও একটা যন্ত্রের কথা ভাবি এবং খুঁজি, আমাদের বেশি দূরে যেতে হবে না। বিদ্যাসাগরের কথা ভাবলেই হবে। বিদ্যাসাগরের জীবন এবং চরিত্রের পাশে দেশের আর পাঁচটা বিনা বাছাই লোককে দাঁড় করিয়ে দিলেই সেই ঈপ্সিত কাজটি হয়ে যাবে। এবং এই ছোট দেখানোর যন্ত্রটাকে 'আর লাগবে না' বলার জায়গায় আজও আমরা পৌঁছতে পারিনি।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রকল্পও পুরোপুরি সফল হয়নি। তিনি যা চেয়েছিলেন, সিলেবাসে ঢুকেছে ঠিকই কিন্তু যারা পড়ায়, শেখায়, তাদের মগজে ঢোকেনি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম—বিজ্ঞান পড়ছ, অঙ্ক শিখছ ভালো কথা। কিন্তু মনে রেখো, এই সবই ব্যাদে আছে। এই সব মগজের সংস্কার তিনি করে যেতে পারেননি। বলেছিলেন, 'সাত পুরু মাটি তুলে নতুন করে চাষ করতে হবে।' তবে মাটিতে কোপানো শুরু করলেও বেশি কাটতে বা তুলে ফেলতে পারেননি।

যদিও আজকাল অনেকেই এই প্রশ্নেও ফুটো বের করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নাকি সাধারণের চলিত ভাষাকে খুন জখম করে সাধু সুসংস্কৃত বাংলা গঠন করে ভাষার জগতে সৌজাত্যের কারিকুরি করে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর কি সংস্কৃত ভাষার পেছনে দৌড়চ্ছিলেন? সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও উচ্চতর পরিশংসার কারণে তাঁর কি খুব সংস্কৃতপ্রেম ছিল। তাহলে আবার তাঁর শিক্ষা নোটের অন্তর্ভুক্ত এই প্রস্তাবটা দেখুন।— *'The study of mathmatics in Sanskrit language is a very complex task and time consuming too. Let mathematics be taught through the English language, writing and arithmetic, it should provide comprehensive knowledge. Education in geogrophy, geometry, literature, natural philosophy, moral philosophy, phisiology, political economy, etc, is very much necessary.*

We want teachers who know both the Bengali and the English language, and at the same time are free from religious prejudices.' (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র)। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অঙ্কটা শেখাতে হবে আধুনিক কালের লেখা ইংরেজি বই থেকে। লীলাবতী আর বীজগণিত নামক সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা আর উচিত হবে না। অঙ্কের বই পড়ার জন্য সংস্কৃত আয়ত্ত করে তারপর উপরোক্ত বই দুটো থেকে যে পরিমাণ অঙ্ক শেখা যাবে, আধুনিক ইংরেজি বই থেকে একই সময় খরচ করে অর্ধেক আয়াসে তার দ্বিগুণ পরিমাণ অঙ্ক শেখা সম্ভব হবে। দ্বাদশ শতকের নয়, উনিশ শতকে বীজগণিত ও পাটিগণিত যে স্তরে এসে পৌঁছে গিয়েছিল, বিদ্যাসাগর সেই স্তরের অঙ্ক শেখাতে বলছেন। সংস্কৃতপ্রীতি দেখতে পাচ্ছেন নাকি কেউ? মেকলের ছায়াও দেখতে পাচ্ছেন? বা ব্যালেন্টাইন প্রীতি? বা রাজানুগ্রহ? রাজারা কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের সেই প্রস্তাব একটাও গ্রহণ করেনি।

বিদ্যাসাগরের আগে ও পরে অনেকেই ইংরেজি শিখেছিলেন। তবে বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিখেছিলেন অন্যদের তুলনায় বেশি বয়সে, নিজ উদ্যোগে, ইংরেজিশিক্ষিত নানা ব্যক্তির কাছে। ইংরেজি শিখে অনেকেই পোশাক-আশাকে, চলন-বলনে, খাবার-দাবারে ইউরোপীয় হয়েছিলেন বটে কিন্তু মনের ভেতরে অনাধুনিক রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের গায়ে পশ্চিমের হাওয়া লেগেছিল, হৃদয়ে ইউরোপীয় মুক্তচিন্তা, মানবমুখিনতার আলো পৌঁছায়নি। বিদ্যাসাগর ছিলেন ঠিক উল্টো। তিনি বাইরে ছিলেন বাঙালি ব্রাহ্মণ (কুলীন রাঢ়ী), কিন্তু মনের ভেতর ইউরোপীয় আধুনিকতাকে ধারণ করেছিলেন। এই আধুনিকতাই বিদ্যাসাগরকে সব ধরনের ভাববাদী চিন্তা থেকে মুক্ত করে মানবমুখিন, পার্থিব করে তুলেছিল। তিনি যে কার সাহেবকে বদলা-অর্ভ্যথনা জানাতে পেরেছিলেন, সেটা খুব সহজ কাজ নয়। যাঁরা বিদ্যাসাগরের মধ্যে ইংরেজপ্রীতি সাহেবসান্নিধ্য রাজানুগ্রহ প্রাপ্তির ছাপ খুঁজে গবেষণা করে বেড়ান, তাঁদের কাছে এই একটি ঘটনাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর জন্য যথেষ্ট। চটি পরে এশিয়াটিক সভাঘরে যাওয়া যাবে না বলায় তিনি যে সেখানে আর কোনও দিনই পা রাখেননি, এও এক নীরব প্রতিবাদ। স্যুটবুট না পরে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া যাবে না বলে তাঁকে একবার যখন দরজা থেকে প্রহরীরা ফিরিয়ে দিল, তিনি বাঙালি পোশাক পরেই আসতে পারেন বলে একাধিকবার খবর দেওয়া সত্ত্বেও তিনি আর কোনও দিনই ওমুখো হলেন না। আমাদের কালেই বা ক'জন প্রতিবাদী এরকম সাহস দেখাতে পারেন? বিদ্যাসাগরের নিন্দা করায়, ত্রুটি খোঁজায় খরচা নেই, বিপদও নেই। কিন্তু তাঁর চরিত্রের দু'একটি গুণও আয়ত্ত করতে হলে খরচা আছে। ঝুঁকিও আছে। আমরা অনেকেই যে তাই নির্ঝঞ্ঝাট অপশন বেছে নিচ্ছি, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এমনও অভিযোগ উঠেছে যে জনশিক্ষা প্রসারে সরকারী উদ্যোগের বিরোধিতা করে বিদ্যাসাগর ধনীশ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষাবিস্তারকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর কেন ১৮৫৯ এর সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলেন নি এই নিয়ে কোনো কোনো গবেষক কমবেশি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আসলে তাঁর লক্ষ্যই ছিল বাংলা ভাষায় এক দল এমন শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা, যারা পরবর্তীকালে ছাত্রদের বাংলাতেই ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান অঙ্ক শেখাতে পারবেন। তাঁদের মধ্য থেকেই একদল উন্নত বাংলা সাহিত্যের জন্ম দিতে পারবেন। তাঁদের ভালো করে শেখাতে হবে সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য। যাতে তাঁরা বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন। সংস্কৃত থেকে আসবে শব্দ ও ব্যুৎপত্তিজ্ঞান। মুসোলিনির কারাগারে বন্দী, বিশিষ্ট মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ, আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) বলেছিলেন—দেশের 'প্রথাগত বুদ্ধিজীবী'দের নিয়ে আগে উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত না করলে নিচের স্তরের ছেলেমেয়েদের শেখাবেন কারা? আর গোড়ার দিকের শিক্ষার সুযোগ তাই সকলে পাবেন না, বরং অল্প লোকই পাবেন (Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, New

York, International Publishers, 1971, pp-26-43, Further Selections from the Prison Notebooks, Minneapolis : University Minnesota Press. 1995, p. 122)। মেকলের লক্ষ্য, একদল ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত তৈরি করা, যারা দেহে ভারতীয় মনে ইংরেজ, এবং শিক্ষা শেষে ভালো কেরানি এবং প্রশাসক হয়ে ইংরেজ বণিকের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে—তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই ঘোষিত লক্ষ্যের কোনও সম্পর্কই নেই। সাদৃশ্য তো নেইই। যে 'সুবিস্তৃত' দেশজ শিক্ষার বিকল্প হিসাবে বিদ্যাসাগর আধুনিক শিক্ষার সামান্য কিছু বৃক্ষরোপন করতে পেরেছিলেন মাত্র, অচিরেই তা ছাত্রসংখ্যায় এবং শিক্ষার গুণেমানে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আধুনিক জীবনযাপনের তুল্য বিদ্যা ও জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিল। এর সুফল বুঝতে বেশিদিন সময় লাগেনি। কাব্যে সাহিত্যে নাট্যমঞ্চে বিজ্ঞানে সাংবাদিকতায় গতানুগতিকের সীমানা পেরিয়ে একদল নতুন মানবসংস্কৃতি কর্মী এসে দেখা দিলেন দেশের বুকে। সেদিনও যাদের চণ্ডীপাঠ কিংবা ঝুড়ি বোনার বাইরে সরস্বতীর কাছে কিছু চাইবার বা পাওয়ার ছিল না, সুদূর পল্লীর তেমন ছেলেও শিক্ষক অধ্যাপক উকিল জজ বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। যাঁরা মনে করেন, বাঙালিদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার অভ্যাস নেই বা উঠে গিয়েছে, বাঙালি শিক্ষিতরা কোনও বিষয়েই নতুন কথা বলতে বা ভাবতে পারেন না, বিদ্যাসাগর গবেষণার প্রশ্নে এসে তাঁরা অচিরেই ভুল প্রমাণিত হবেন। বিদ্যাসাগর বধে গত দেড় শতাব্দী ধরে অনেক নতুন নতুন অজুহাত তৈরি হয়েই চলেছে কিন্তু সেসবকে ছাপিয়েই তিনি আজ কালোত্তীর্ণ মহিমায় উত্তীর্ণ।

ডিরোজিও আর ইয়াং বেঙ্গলের মারফত একই সঙ্গে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা আর যুক্তির যুগ-এর ধারণা এসেছিল বাঙলায়। বিদ্যাসাগরও তাঁর নিজস্ব রীতিতে আধুনিক পৃথিবীর সেইসব ধারণাকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন। এই দিকটিতে জোর দেওয়া হয় না, অথচ এর ওপরেই তাঁর গোটা জীবন-দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। পরাধীন ভারতে বিদ্যাসাগর যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁর সীমাবদ্ধতা ছিল। এই আন্দোলনের সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের কোনো সংস্রব ছিল না, সংস্রব ছিল না হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের মানুষেরও। ঐতিহাসিক কারণে মুসলিম সমাজও এসব কর্মকাণ্ডের অংশীদার ছিল না, বিধবাবিবাহ আন্দোলন তাঁদের জন্য প্রাসঙ্গিকও ছিল না। কিন্তু তাই বলে পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের কাজের সুফল যে নিম্নবর্ণের মানুষ বা মুসলমানরা ভোগ করেননি বা বিদ্যাসাগর দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি, তা নয়। বিদ্যাসাগর যে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন, বাঙালি মুসলিম সমাজকে তার অংশীদার করাই ছিল বেগম রোকেয়ার ব্রত। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব—এই স্লোগান নিয়ে যাঁরা বাঙালি মুসলিম সমাজে বুদ্ধির মুক্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিলেন।

হ্যাঁ, ওঁদের কথাও বলতে হবে বৈকি! তাঁরা হলেন আর এক জবরদস্ত প্রতিপক্ষ। চরমপন্থী মার্ক্সবাদী। এক কালে সেই অতিবাম পক্ষ এসে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিদ্যাসাগর কেন কৃষিবিপ্লবের পক্ষে কথা বলেননি, কেন সংস্কৃত কলেজের দরজা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য খুলে দিতে পারেননি, কেন তিনি সিপাহি বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজ ভবন ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ইত্যাদি। এই সব প্রশ্ন তুলে তাঁরা রাজনীতির আসর গরম করে ফেলেছিলেন। তাঁরা অনেকেই ছিলেন বিরাট মাপের বুদ্ধিজীবী। কবি ও লেখক। সদর্থেই। বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা ছিল বিপুল। সেই আশা ভঙ্গ হওয়ার নিরাকার ভাবমূর্তি ভাঙতে চেয়ে তাঁদের কিছু কর্মী এখানে ওখানে বিদ্যাসাগরের সাকার প্রস্তরমূর্তি ভেঙে ফেলেছিলেন। এ পরম্পরার নজির আমরা সাম্প্রতিক অতীতেও দেখেছি। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতায় আজ তাঁদের উত্তরসূরিদেরও প্রগতির ক্রিজে বিদ্যাসাগরের ব্যাট হাতে দাঁড়িয়েই প্রতিক্রিয়ার শিবিরের ক্রমবর্ধমান দক্ষিণপন্থী আগ্রাসনকে, মৌলবাদের বাউন্সারগুলিকে ঠেকানোর কথা ভাবতে হচ্ছে। এটুকুতে বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে জয়ী হয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে কোনও কথার মানে একেবারে সেই কথাই। অন্য কথা নয়। তিনি যখন বললেন, 'আমি দেশাচারের দাস নই। যা কর্তব্য মনে করি তা পালন করার জন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতেও পিছিয়ে যাব না'—তার মানে একেবারে এটাই। তাঁর পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি নিয়ে বাজারের কত গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বর্ষাকাল— দামোদর—ভয়ঙ্কর স্রোত—সাঁতার, এমনি আরও কত কিছু। অথচ বিধবাবিবাহ আইন প্রচলন ও প্রয়োগ করতে গিয়ে বাবা-মা-স্ত্রী পরিবারের প্রায় সকলের সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটে গেল। ভাই শঙ্কুচন্দ্র যখন চিঠিতে লিখলেন, 'পিতামাতা অসন্তুষ্ট হইতেছেন', ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যুত্তর দিলেন, 'আমি জ্ঞানত তাঁহাদের সুখের কোনও ব্যাঘাত ঘটাই নাই, তাঁহারা কেন আমার সুখপ্রদায়ক কর্মের ব্যাঘাত হইবেন?' বিদ্যাসাগর অটল রইলেন। এই জেদ বংশগত বা জিনগত নয়। এ কোনও রামজয় বা তর্কভূষণ থেকে আসেনি। কেন না, এ নিছক জেদ ছিল না, এ ছিল এক দৃঢ় সঙ্কল্প, অর্জিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফসল, বিশেষ কিছু আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতার লক্ষণ। সততা আদর্শনিষ্ঠা তিনি হয়ত পারিবারিক সূত্রেই কিছুটা পেয়েছিলেন। কিন্তু নবজাগরণের নব্য ঐহিক মানবতন্ত্রের প্রেরণা তাঁকে দিয়েছিল আধুনিক জ্ঞান ও প্রগতির বার্তা। যাঁরা এই গঙ্গাজলের সন্ধান ও স্পর্শ পাননি, ঘটিপুকুরের পানিকেই গঙ্গাজল ভেবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু কিছু মানবসেবা করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা তাই একটু-আধটু প্রগতি করেই দেহে মনে ক্লান্ত হয়ে বিরতি খুঁজেছেন আর বিদ্যাসাগরের অস্থির অচঞ্চল কর্মস্পৃহাকে বাহ্য জেদ বলে সরল বা তরল করে দিতে চেয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে এক স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা খুব জরুরি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন : এই বাংলাদেশে তাঁর মতো চরিত্র কী করে কোত্থেকে জন্ম নিল? বিষয়টা উনিশ শতকের শেষ অর্ধে যেমন জটিল ছিল, আজ এই একুশ শতকের পথে চলার সময়ও একইরকম জটিল আছে। আমাদের চারপাশে যাদের আমরা প্রতিদিন দেখি—আমাকেও আপনি দেখেন, আপনাকেও আমি দেখি, এটা তার মধ্যে ধরা আছে কিন্তু সেই আমরা প্রায় সজ্ঞানেই কিছু না কিছু অন্যায় করে ফেলি, কিছু না কিছু অন্যায়ের সমর্থনে বক্তৃতা দিই, নানা জায়গায় অন্যায় সুবিধা নেওয়ার বা পাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু অন্যকে সেই চেষ্টা করতে দেখলে নিন্দা করি, নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করি না, কিন্তু অপরের একইরকম দায়িত্বহীনতা নিয়ে আমরা তুমুল সরব। এটা ভাবলে ভুল হবে যে এরকম স্বভাব শুধু একালেই আমাদের মধ্যে জন্মেছে, এরকম মানুষ যে তখনও অনেক ছিল, বস্তুত বেশিরভাগই ছিল, তা রবীন্দ্রনাথ বা রামেন্দ্রসুন্দরের লেখা থেকেই জানা যায়।

এটাও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সঠিক কথা বলেছেন যে বিদ্যাসাগরের নামের আগে দেশবাসীর তরফে দানসাগর, দয়ার সাগর ইত্যাদি ভালো ভালো কিছু বিশেষণ বসিয়ে দিয়ে তাঁর ভেতরের আসল 'মানুষ'-টাকে কার্যত অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যা বা দয়া নয়, তাঁর চরিত্রের আসল পরিচয় তাঁর 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব' এবং 'অজেয়-পৌরুষ'-এর মধ্যে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানে দানধ্যানের অনেক কথা আছে। রাজা হর্ষবর্ধনও প্রচুর দান করতেন। বাংলাদেশের অনেক জমিদারই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি বাড়ি টাকা পয়সা দান করেছেন। লক্ষ করলেই দেখবেন, সেই সব দানকীর্তি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে লিখিত স্থায়ী দলিল বানিয়ে রাখা আছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের গায়ে সেই সব দাতাদের (বা তাদের পিতামাতার নাম) নাম জ্বলজ্বল করতে থাকে। মাঝে মাঝে সেখানে চুনকাম করে রংটং লাগিয়ে চকচকে করে তোলা হয়। সবাই যেমন দেখতে পায়। বিদ্যাসাগরের দানের একটা স্থায়ী লিখিত নথি বের করুন দেখি। সারা বাংলায় একটা প্রতিষ্ঠান, একটা ভবন, একটা বিভাগ খুঁজে বের করা যাক—যার দেওয়ালে বা কোথাও সিমেন্ট বা পাথরে খোদাই করে বা লিখে বিদ্যাসাগরের দানের কোনও স্বীকৃতি আছে। বিদ্যাসাগরের দানে, তাঁর সহায়তায় সেই কালে উপকৃত হননি, এমন মানুষ এমন স্কুল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অথচ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জলধর সেন বা নবীনচন্দ্র সেনের মতো কয়েকজনকে ছাড়া আর কজনকেই বা আমরা দেখি সেই কৃতজ্ঞতার সামান্যতম প্রকাশ ঘটাতে? এই রকম সাহায্য, যা যে দেয় আর যাকে দেয় সেই দুজনের বাইরে আর খবর হয় না, এটা করতে পারার জন্য বিরাট ক্ষমতা লাগে। মনের বিপুল উচ্চতায় পৌঁছতে হয়। নৈতিক মূল্যবোধের এক শক্তিশালী পরাকাষ্ঠা লাগে। একবার সেই চূড়ায় উঠলেই হয় না, সেখানে নিজেকে ধরে রাখতে হয় দৃঢ়ভাবে। অনেক দিন ধরে। চতুপার্শ্বের নীচতা ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা স্বার্থপরতা দুর্বলতা যাতে নাগাল না পায় তাদের আস্তাবলে টেনে নামানোর। মাও সে-তুং-এর কথা ধার করে বলা যায়, একটা দুটো ভালো কাজ করা তেমন কঠিন নয়, সারা জীবন ধরে ভালো কাজ করে যাওয়াটা যথার্থই দুরূহ। জানতে পারলে মাও হয়ত চিনের লোকদের বলতেন, ভারতের এই মানুষটাকে দেখে রাখো, তাহলে আমার কথাটা খানিক বুঝতে পারবে। ঘোষিত ও পোষিত আদর্শের সঙ্গে মানুষটা যেন একাত্ম হয়ে ছিলেন।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যতজন যতকিছু লিখেছেন, বিশেষ করে যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন—সেগুলির নিশ্চয়ই কমবেশি মূল্য আছে। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) বিদ্যাসাগর স্মারক বক্তৃতা (১৩০৫ ব.) সেদিক থেকে একটু আলাদাই। সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে বিদাসাগরের মনন-এর দিক। আট-ন বছর বয়স থেকে তিনি বিদ্যাসাগরকে দেখেছিলেন,বিনা ছেদে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৯১)। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর 'দেহরাজ্যের জীবনকে তুচ্ছ জানিয়া মনন-রাজ্যের জীবনকেই সারজ্ঞান' করতেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী এই মনন রাজ্য-বাসীদের চরিত্রর কয়েকটি উপাদান শিবনাথ শাস্ত্রী তুলে ধরেন। প্রধান উপাদান 'বর্ত্তমানে অতৃপ্তি'। তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তিনি : 'বর্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যত রচনা ও নিজ-মনন-গঠিত আদর্শের অনুরাগ...। মহৎ ব্যক্তি মাত্রেই এই তিনটি গুণের অধিকারী হন। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর ছিলেন এইরকমের পাগল। 'বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিলে দেহরাজ্যের সামান্য জীবনে কী সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না? তিনি নিজের শ্রমের অন্ন কি সুখে আহার করিতে পারিতেন না? নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে পণ্ডিতকুলের মধ্যে যশস্বী হইয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সৌভাগ্যলক্ষীর ক্রোড়ে কি বাস করিতে পারিতেন না? এর সবগুলিই আলঙ্কারিক প্রশ্ন। সবকটির উত্তর : হ্যাঁ পারতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লেখেন : 'কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সে পথে যাইতে দিলেন না। কী যেন কিসের জন্য তাঁহাকে পাগল করিয়া জগতের মহৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিয়া দিলেন।' [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' ও শিবনাথ শাস্ত্রীর' পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' ভাষণ দুটি বিমান বসু সম্পা. প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, ১৯৯১, পৃ. ৮৪-৯৫ ও ১৭-৩০-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।]

'পৌরুষ কথাটাও এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। হালে কেউ কেউ হয়ত এই শব্দটায় আপত্তি জানাতে পারেন। তবে আক্ষরিক (রমণীয়তার বিপরীত) অর্থে না ধরে এর মধ্যে নিহিত ভাবার্থটিকে ধরতে হবে। ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র অর্থে। ব্যক্তি আমরা সকলেই—কি সেদিন কি আজ, কিন্তু ব্যক্তিত্ব সকলের থাকে না। ব্যক্তিত্ব এক রকমের সজীব স্বকীয় সক্রিয় স্বাতন্ত্র্য—নানা গুণের সমাহার হিসাবে যা একজনকে অন্যদের থেকে, গড়পড়তাদের থেকে, পৃথক সত্তা বলে চিনিয়ে দেয়। স্বার্থবোধ ও স্বার্থপূরণকে কেন্দ্র করে সমাজে সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির যে নিরন্তর চলমান অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব, সেখানে প্রতিটি সংঘর্ষই ঘর্ষণের মতো চলিষ্ণু মানুষের প্রগতির গতিকে থামিয়ে দিতে চায়। নানা রঙের পিছুটান। ফলে, ভেতর থেকে ক্রমাগত আত্মিক আদর্শগত বল প্রয়োগ করে সেই ঘর্ষণ অতিক্রম করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে যেতে হয়। তবেই না থেমে ক্রমাগত পথ চলা যায়। আপন গন্তব্যের অভিমুখে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ—মহম্মদ রিয়াজুদ্দিন আহমেদ নামের এক বরিশালের এক যুবক খানিক কুণ্ঠিত হয়েই 'বোধদয়'-এর কিছু 'ত্রুটি' উল্লেখ করে বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠি লেখেন। তাকে অবাক করে দিয়ে কিছুদিন পরেই

বিদ্যাসাগর শুধু যে প্রাপ্তি-স্বীকার করেই দায় সারলেন এমনটা নয়, 'ত্রুটি' স্বীকার করে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ঋণ স্বীকারও করলেন (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র)।

ঈশ্বরচন্দ্র শত নিন্দা শুনলেও কারও বিরুদ্ধে কোনও নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করতেন না। মতাদর্শগত বিতর্কে বিপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক কড়া কথা উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারও বিরুদ্ধে নিন্দা করার নীচতা তাঁর ছিল না। তাঁর সমালোচক তাঁর নিন্দুক সেইকালে তো কম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যিক মানুষও তাঁকে বিরোধিতা করে কলম ধরেছেন, উপন্যাসের এক চরিত্রের মুখ দিয়ে খুবই অশালীন মন্তব্য করিয়েছেন (বিষবৃক্ষ উপন্যাস এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকাতে)। বিদ্যাসাগর তাতে নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু পালটা একটাও কটু কথা তিনি বলেননি। বরং একবার যখন কোনও এক সভায় সুযোগ এল, তিনি বঙ্কিমকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে খানিক রসিকতাই করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর থামতে পারেননি। ১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ম্যালেরিয়ার মারাত্মক প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন জাত-ধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্রতম মানুষদের সেবা/ত্রাণ কাজে। তাঁর এরকম এক জীবন্ত ব্যক্তিত্ব ছিল, অটল চরিত্র ছিল। যা কোনও চাপ, কোনও লোভ বা কোনও ভয়ের কাছে মাথা নীচু করে না। মগজে 'স্যাপিয়েন্স' হলেই সকলে মেরুদণ্ডে 'ইরেকটাস' হয় না। অনেকেই একটু প্লাস্টিক ভাব নিয়ে চলে। যেখনে যেমন দরকার হয় এদিকে ওদিকে সামনে পেছনে এঁকেবেঁকে চলে। বিদ্যাসাগরের এই নমনীয়তাটাই ছিল না। যা ঠিক বলে বুঝেছেন করে গেছেন। দায়িত্ব নিয়ে যা করার কথা, করতে না পারলে পদ ছেড়ে দিয়েছেন। পদ বাঁচিয়ে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার কায়দাকানুন তিনি কখনই আয়ত্ত করে উঠতে পারেননি। এও আর একটি সেই স্বভাবগুণ, যা আমরা বেশিরভাগই আজও অর্জন করিনি। নীতিহীন ক্ষমতাশালী এবং হতচরিত্র বিত্তবানের কাছে আপস আমাদের প্রায় স্বাভাবিক আচরণ হতে চলেছে. বিদ্যাসাগর তাঁর অটুট ঋজুত্ব নিয়ে আজও আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বেমানান!

অন্যদিকে, ১৮৪৩-১৮৫৫, একটানা বারো বছর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন অক্ষয়কুমার। সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন migrain জনিত অসুস্থতার কারণে। অমানুষিক শ্রম থেকে অব্যাহতি নিয়ে বিদ্যাসাগরের অনুরাধে নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিলেন। একটা মাস-মাইনে তো প্রয়োজন। কিন্তু এই কাজটাও করতে পারলেন না। বছর না ঘুরতে ছেড়ে দিলেন। অসুস্থতার খবর পেয়ে জার্মানি থেকে ম্যাক্সমুলার চিঠি লিখেছেন অক্ষয় দত্তকে। অসুস্থতা নিয়েই করেছেন 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইটির কাজ। হিন্দু ধর্ম-এ নানা শাখাপ্রশাখা, নানান সম্প্রদায়, বিচিত্র আচরণ। অন্যান্য ধর্মও খুব ব্যতিক্রম নয়। এমনই ১৮৫টা সম্প্রদায়কে নিয়ে দুই খণ্ডে প্রকাশিত (১ম খণ্ড ১৮৭০ এবং ২য় খণ্ড ১৮৮২; ভারতীয় ভাষা চর্চার ওপর বাংলাভাষায় প্রথম বই) এই বইয়ে তিনি প্রকাশ্যে ভাববাদী চিন্তাকে আক্রমণ করেছেন। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণকে মানসিক রোগ বলতেও ছাড়েননি। সব থেকে বড় কথা, এই বইয়ের অনেকটাই তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষার ফসল।

একালে মানুষের পরিচয় রাজনৈতিক বিশ্বাস দিয়ে। বিদ্যাসাগরের সময়ে অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল তৈরি হয়নি। গণতন্ত্র শব্দটিও চালু ছিল না। তাঁর জীবন কেটেছে খানিকটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে (১৮২০-১৮৫৮), বাকিটা মহারানি ভিক্টোরিয়ার অধীনে (১৮৫৮-১৮৯১)। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫-তে। বিদ্যাসাগরের তাতে কোনো উৎসাহ ছিল না। তবে কী তিনি রাজনীতি সচেতন ছিলেন না? ঈশ্বর গুপ্তর মৃত্যুর পর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় বাংলা সংবাদপত্রের পরিমণ্ডলে কিছুটা শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনীরও আগের মতো গৌরব ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই সময় একটি সংবাদপত্র প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক পত্রিকা—সোমপ্রকাশ। যার মূল পরিকল্পনা প্রস্তাবক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রেসসংক্রান্ত আইন, ইলবার্ট বিল, বেঙ্গল ন্যাশনাল লিগ, ভারত সভা প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণ সমালোচনা করা হতো। এখানেই প্রকাশিত হয়েছিল 'ইংরেজ অধিকারে ভারত সুখী না অসুখী', 'ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর মহাদোষ', 'ভারতবর্ষকে হস্তে রাখিয়া ইংল্যান্ডের লাভ কি' ইত্যাদি বিষয়ক নিবন্ধ। ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সোমপ্রকাশ লর্ড লিটনের রোষানলে পড়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য ভার্নাকুলার প্রেস আইনের প্রয়োগ করে সোমপ্রকাশ-এর ছাপানো বন্ধ করে দেন (১৮৭৯)। অক্ষয়কুমার দত্ত কি রাজনীতি বিমুখ ছিলেন? তাঁর সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা' শীর্ষক প্রতিবেদন যা শুধু জমিদার নীলকর সাহেবদের বাংলার কৃষক সমাজের প্রতি শোষণ ও বঞ্চনার এক ধারাবাহিক দলিলই নয় একাধারে তৎকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', জমির ওপর কৃষকের অধিকার, মধ্যসত্ত্বভোগী ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকেও তিনি বলিষ্ঠভাবে আলোকপাত করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়। তাঁর 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' (১৮৯০) বইটি প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপর লেখা যা প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে।

বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষবেলায় যখন দেশীয় বেনিয়াপুঁজি ধীরে ধীরে শিল্পপুঁজিতে (industrial capital) রূপান্তরিত হতে চলেছে তখন এই পুঁজিবাদীদের মদতে পাশ্চাত্য রাজনীতির 'গণতান্ত্রিকতা', 'বিপ্লব' প্রভৃতির ছেঁড়া ছেঁড়া ধারণা নিয়ে কিছু বুর্জোয়া মাতামাতি করতে থাকে। এই অবস্থাটা তাঁর 'কথামালা'র সেই গল্পটাকে মনে করিয়ে দেয় যেখানে এক কুকুর সারাদিন বণিকের বাড়িতে শিকল বাঁধা থাকে শুধু রাত্রে ছাড়া পায় বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য, পরিবর্তে পায় ভালো ভালো খাবার। বনের ক্ষুধার্ত বাঘকে যখন সে গলায় শিকল পড়ে আহারের নিশ্চয়তার লোভ দেখায় তখন বাঘ জবাবে জানায় যে ঐ শৃঙ্খলা, দাসত্ব থেকে তার স্বাধীন বনচারী জীবন অনেক ভালো। ১৮৮৬-তে গণ্যমান্য ধনীবাবুদের উদ্যোগে যে 'জাতীয় কংগ্রেস' গঠিত হয় তা মূলত ব্রিটিশ শক্তির কাছে আবেদন-নিবেদনের একটা মঞ্চ হিসাবেই দিনের আলো দেখেছিল। এই বাবুদের রকমসকম দেখে বিরক্ত হয়ে তিনি মন্তব্য করেন—"The 'babus' are active for the Congress; they are bragging, delivering speeches, boasting of saving India; every day thousands are dying of starvation, but nobody is paying attention to it" (*করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র*) জাতীয় রাজনীতির এই আপোষকামী চরিত্র তাঁর চোখে সেই সময়েই ধরা পড়ে গিয়েছিল।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের যে ব্যক্তিত্বের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তা ছিল সময়ের ফসল, ইতিহাসের নির্মাণ! বাংলার সমাজ, বাংলার ইতিহাস তখন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পেরিয়ে লালনের কালে এসে উদার ধর্মসংস্কৃতির প্রচারের মধ্য দিয়ে যে দেশজ নবজাগৃতির দিকে এগোচ্ছিল, ডিরোজিও এবং রামমোহন এসে যার মধ্যে কিছুটা ইউরোপীয় আলো ফেলে দিলেন। আধুনিক শিক্ষা এবং যুক্তিতর্কের পথ ধরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার আবাহন এবং ইংরেজি ভাষার চর্চা যে জানালাটাকে খুলে দিয়েছিল, তাঁরা তার প্রত্যক্ষ তাৎক্ষণিক এবং শ্রেষ্ঠ উপজ বলা যায়।

স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরে, আজও যখন দেখি জাতপাত, ধর্মীয়সংকীর্ণতা, শিষ্টাচারহীনতা, সীমাহীন দুর্নীতি, মিথ্যাচারিতা, শঠতা আর কূপমণ্ডুকতার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে দেশবাসীর মন ও মননকে, যখন দেখি শাসকশ্রেণীর অনুসৃত ভ্রষ্ট নীতির পরিণামে অর্থনৈতিক মন্দা ও অতিমারীদীর্ণ ভারতের জনগণ প্রতিনিয়ত যন্ত্রনার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হচ্ছে, যখন দেখি সংবিধানের মৌলিকত্বকে বিনষ্ট করে স্বাধীন দেশের

নাগরিকদের মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকারকে হরণ করা হচ্ছে, সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে তখন জন্মের দু'শো বছর পরেও আমাদের নতুন করে ফিরে তাকাতে হয় বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্তের মতো প্রগতিপথের অভিযাত্রীদের দিকে। তাঁদের অবদানকে স্মরণ করে নতুন পথে অনুসন্ধান করতে হয় বস্তুবাদের স্বরূপ, মানবমুক্তির দিশা।

তাই, জন্ম-দ্বিশতবর্ষের আলোয় বাংলার নবজাগরণপর্বের এই দুই ভগীরথকে স্মরণ করার সূত্রে, কোভিড-১৯ মহামারীদীর্ণ আমাদের এই সময়ে আমরা ফিরে তাকাতে চাই আমাদের দেশ ও সমাজের নানান উথাল পাথালের দিকে। বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা চেতনা ও মুক্তবুদ্ধির শিখা জ্বালিয়ে যারা আমাদের দেশবাসীকে স্বস্থ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অবদানকে স্মরণ করে বস্তুত আমরা আমাদের চলার পথটিকেই আলোকিত করতে চাই এই অন্ধকারে। পূজার ছলে ভুলে থাকা নয়, আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ণতার পথে অগ্রসর হবে তখনই যখন আমরা অনুধাবন করতে পারব জনপ্রিয়তার গড্ডল-বিকার নয়,সমাজকে সাফ-সুতরো করতে হলে স্রোতের বিপরীতে দাঁড় টানবার সাহস সঞ্চয় করতে হবে মননদীপ্ত অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ হয়ে। আজকের পটভূমিকায় সেই লড়াইয়ে অগ্রপথিকদের স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা প্রেরণার সেই দীপশিখাকেই পুনর্বার প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে চাই। 'নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে' জীবনের ভিত্তি যখন কেঁপে ওঠে বারবার তখনই এইভাবে ফিরে ফিরে যেতে হয় মহাপ্রাণ সমীপে, তাঁদের জীবনকৃতির বেদীমূলে প্রাণের দীপকে প্রজ্জ্বলিত করে 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা'র ভস্মস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মত ডানা মেলে এই বরাভয় ধ্বনি— '...আপনারে ভুলো না কখনো...'। ❐

ঋণ স্বীকার—১. বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র, ২. করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র, ৩. বাবু অক্ষয় কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত—মহেন্দ্রনাথ রায়, ৪. অক্ষয় কুমার দত্ত—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫. অক্ষয় কুমার দত্ত: মুক্তিবুদ্ধির অগ্রদূত—অশোক মুখোপাধ্যায়, ৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: ফিরে দেখা—অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭. বিদ্যসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, ৮. অন্যান্য পত্র-পত্রিকা।

লেনিন—আজও প্রাসঙ্গিক

অরিন্দম বক্সী

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফল হল তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লব। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে শুরু হওয়া প্রযুক্তি বিপ্লব গোটা বিশ্বসমাজকে প্রতিনিয়ত নতুন বাস্তবতা ও দ্বন্দ্বের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজবিজ্ঞানের ধারায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে ওৎসুক্য ও প্রগতির নিয়ম ও সূত্র সমুহ জেনে বুঝে অনুশীলনের মধ্যে আয়ত্ত্বে আনার ঐতিহ্য বহুদিনের। মার্কস এবং এঙ্গেলস দুজনেই গভীরভাবে বিগত প্রযুক্তি বিপ্লব (শিল্প-বিপ্লব)-এর ধারা গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমাজে তার ফলশ্রুতি ও তার সাধারণ সূত্রগুলো অনুধাবন করেছিলেন। উত্থিত হয়েছিল নতুন বস্তুবাদী দর্শন। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

উইলহেলম লেইবনেখ্‌ট-এর সাথে কথোপকথনে উৎসাহী মার্কস বলেই ফেলেছিলেন প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্র অবিচ্ছেদ্য।

বিগত প্রযুক্তি-বিপ্লব বা শিল্প-বিপ্লব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। মার্কস-এঙ্গলস-এর বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনের সুমহান ঐতিহ্য লেনিন সমান মাত্রায় ধারণ ও বহন করেছিলেন এবং এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন।

(২)

রুশ বিপ্লবের ঠিকপরে ২৬ মে ১৯১৮ সোভিয়েত-রাশিয়ার প্রথম অর্থনৈতিক কাউন্সিল-এ লেনিন বলেছিলেন—'Socialism alone will liberate science from its bourgeois fetters, from its enslavement to capital, from its slaverey to the interest of dirty capitalist greed.'

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রযুক্তি বিপ্লব এমন সব দ্বন্দ্বের ও সংঘাতের সৃষ্টি করে যা সেই ব্যবস্থার পক্ষে নিরসন করা সম্ভব নয়। প্রযুক্তিবিপ্লব যাবতীয় পুরাতন সম্পর্ককে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

তবে, একথাও বুঝতে হবে যে প্রচণ্ড শক্তিশালী এই প্রযুক্তিবিপ্লব সমাজ ও তার বিকাশেরক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে ঠিকই, তবে তা আপনা-আপনি সমাজ ব্যবস্থাটা পরিবর্তন করতে অক্ষম। সে কাজ মানুষের। বলা যেতে পারে অবজেকটিভ বা বিষয়গত পরিস্থিতিকে এই প্রযুক্তিবিপ্লব অনেক পরিপক্ক এবং সম্ভাবনাময় করে তোলে নতুন সমাজ সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে।

মানবেতিহাসে কৃষি, শিল্পবিপ্লব প্রভৃতি স্তর থেকে বিকশিত হয়ে তৃতীয় পর্যায়ে এসে প্রযুক্তি বিপ্লব আধুনিক রূপ (form)-এ উন্নীত হয়েছে। এই পর্য্যায়-এর সামাজিক সংকট শিল্পবিপ্লবের সময়ের সামাজিক সংকটের সাথে তার অনেকাংশে মিল থাকলেও অনেকক্ষেত্রে স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য বহন করে। দাস ও সামন্ত সমাজে চাবুকের যে ভূমিকা ছিল, শিল্প-বিপ্লবে অনাহার হয়ে ওঠে সেই চাবুকের বিকল্প। জন্ম নেয় স্বাধীন দাস বা প্রোলেতারিয়াত-এর।

প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে প্রকৃতিকে আরও বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ এবং মানুষের নিজের ক্ষমতায়ন এক অসীম

মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট যা সাধারণ সংকটে পর্যবসিত হয়েছিল লেনিনের সময় থেকেই, তাও আজ বিশ্বকে দাঁড় করিয়েছে এক অতল খাদের সামনে। গোটা বিশ্বে সমগ্র মানবজাতি একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সামনে এসে হাজির হয়েছে। পুরোনো ব্যবস্থা আর চলছে না, মানুষও চাইছে না পুরোনো কায়দায় আর শোষিত হতে। উৎপাদনের সামাজিকীকরণ এমন একটা মাত্রায় পৌঁছেছে যে তার মুনাফা গোটা বিশ্বজুড়ে কয়েকটি গোষ্ঠি ও পরিবারের হাতে নিয়ন্ত্রিত হতে পারছে না। সামাজিক মালিকানা এর অমোঘ পরিণতি।

লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমসাময়িক সামাজিক সংকট ও সমস্যাগুলি কেবল ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ভবিষ্যতের অবস্থান থেকেও বিচার করা প্রয়োজন।

আজকের প্রযুক্তি নিবিড় শিল্প-এ অতি উচ্চমানের ও মেধার শ্রমিক প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এরাই হল knowledge worker যারা বৌদ্ধিক শ্রম দেয়। অশিক্ষিত অপটু শ্রমিক আজ unproductive।

নতুন প্রজন্মের কর্মীদের জীবনের অনুপ্রেরণা, চাওয়া পাওয়া সাবেকী চাওয়া-পাওয়া থেকে অনেক আলাদা। তাদের উৎপাদনশীলতা, কেবল মুনাফা অর্জনের লক্ষে ধাবিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্ক ধারণ করতে অক্ষম।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে Software-এর উন্নতিকরণ কখনো ব্যক্তিমালিকানার অধীনে আটকে রাখা যায় না। তাই পেটেন্ট বা intellectual property rights-এর আইনের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানকে ব্যক্তিমালিকানাধীন করে রাখার মরীয়া চেষ্টা। ছোটখাটো উদ্যোগগুলিকে Microsoft বা Google-এর মতো কর্পোরেটরা কিনে ফেলে সেই 'তিমিঙ্গিল, তিমিঙ্গিল-গিল'-এর মত। 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না...'।

অপরদিকে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে শিল্প উৎপাদনের বান ডেকেছে। ব্যাপকহারে উৎপাদিত দ্রব্যের কিন্তু বাজার নেই। বিশ্বজোড়া মন্দা এবং ব্যাপক বেকারী। অতিমারিতে অবস্থা আরও সংকটাপন্ন। ধনতান্ত্রিক দুনিয়া দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কিন্তু কর্পোরেটদের মুনাফা বেড়েছে।

(৩)

মহাবিশৃঙ্খল অতিউৎপাদন বাজার খুঁজতে কৃত্রিম চাহিদা তৈরীকে হাতিয়ার করেছে। যুদ্ধ বাধিয়ে অস্ত্রের বাজার বাড়াও। গণমাধ্যমের সাহায্যে মানুষের মধ্যে পণ্যের জন্য কৃত্রিম চাহিদা তৈরী করো। সাথে মানুষের মনোজগৎকে শিশু বয়স থেকেই আচ্ছন্ন করার প্রচেষ্টাও আছে। মানুষ যাতে ক্ষেপে গিয়ে প্রতিবাদী না হয়ে ওঠে; একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে মানুষের ব্যবহার যাতে নিয়ন্ত্রিত করা যায়—এই উদ্দেশ্য নিয়েই সমগ্র প্রচার এবং গণমাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করা হয়, জনগণ যাতে শাসকশ্রেণির বশংবদ হয়ে পড়ে। এই মনস্তাত্ত্বিক আবেশ বা ঘোর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাপনের জ্বালা যন্ত্রণাকে মেটাতে পারেনা। নেশার সাথে বাস্তবতার দ্বন্দ্ব চিরকাল। তাই এ সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। নেশাতুর মানুষ তবু একদিন জেগে উঠবেই। যেমন একদিন নেশা কাটিয়ে চীন জেগে উঠেছিল।

'যো করে গাঁজা কা মন্দ,
উসকা শির তোরে পঞ্চানন্দ।'

পঞ্চাননন্দদের এটাই কাজ। মাথা ফাটনো বা গোলানো। এ ঘোর, নেশার বা ধর্মের—তাকে মন্দ বলা যাবেনা! ঘোর টিঁকিয়ে রাখতে হবে। 'The show must go on.' এতোদিন এই ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখতো চার্চ,পাদ্রী, মেগাবাবা-মায়েরা, sooth-sayers, সন্ত-সাধু হরেক কিসিম-এর লুচ্চা লম্পট ভোলেবাবারা। কিন্তু ব্যবস্থাটাকে টিঁকিয়ে রাখতে এবং মানুষকে শ্রেণিহীন ভ্রাতৃত্ব বা ভাগবত প্রেম ভালবাসার নামে বুঁদ করে রাখতে ক্রমাগত

ধর্ম/পন্থ/ রিলিজিয়ন বা বিভিন্ন সেক্টের বিভাজন অত্যন্ত জরুরী। এখানে থেকেই culture state-এর ধারণার জন্ম। গোটা রাষ্ট্রটাকেই যদি চার্চ বানিয়ে দেওয়া যায় তা হলে কেল্লা ফতে। ফ্যাসিজমের মত এটিও (culture state) irrationalism এর একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

ISIS, তালিবান অথবা হিন্দুরাষ্ট্র। ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুশাসনে রাষ্ট্রকে গড়ে তুললে একুশে আইনের মাধ্যমে মানুষকে জব্দ করার কৌশল সব থেকে কার্য্যকরী। সামাজিক উৎপাদনের উপর পুঁজির ব্যক্তিমালিকানার এই উদ্ভট অযৌক্তিকতা আর অন্য কোনভাবে টিঁকিয়ে রাখা যাবে না। তাই, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই 'মনুস্মৃতি' অনুসৃত একটা culture state; কর্পোরেটদের হিন্দুত্ব প্রেমের উৎস এখানে। মানুষকে বিভক্ত করে শ্রেণি শোষণ চালানোর হাতিয়ার হল Culture State. একচেটিয়াদের রাষ্ট্রকে শুধু বশম্বদ করলেই চলেনা। রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষকে বশম্বদ করতে হয়। সোভিয়েত পতনের পর রাষ্ট্রকে তো একচেটিয়ারা হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। রাষ্ট্রের একমাত্র ও পরম কর্তব্য হল কীভাবে কর্পোরেটদের Bailout করবে আর জলের দরে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দেবে। এখন চাষ এর উপরেও কর্পোরেটদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে আইন কানুন-এর মাধ্যমে। ১৯৯২-এর পরে রাশিয়াতেও আমরা Gangster Capitalism দেখেছি।

(৪)

লেনিন ছিলেন মার্কস-এঙ্গেলস-এর যোগ্যতম উত্তরসুরী। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সমাজে আরও উন্নতমানের সামাজিক সম্পর্ক দাবী করে। এ সম্পর্ক পুঁজিবাদ কিছুতেই দিতে পারে না। তাই পুঁজিবাদ moribund, মুমূর্ষু।

আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন বহুভাবেই সাবেকী পণ্য উৎপাদন থেকে আলাদা। পণ্য ব্যক্তির দ্বারা অধিগৃহীত হয়ে ব্যক্তিগত দখল এবং মালিকানা তথা ভোগ বা ভোগ্যপণ্যের সার্থক পরিণতি লাভ করে। অপরদিকে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে লগ্নী করে তার বিকাশকে মুনাফাতে রূপান্তরিত করে ঘরে তোলার বাস্তবতা কমে আসছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আলাদা করে দৈত্যের মত বোতল বন্দী করা অসম্ভব। চটজলদী মুনাফাও সম্ভব নয়।

আর একটি মূল প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে। প্রযুক্তি বিপ্লব কি মানুষকে সামাজিক উৎপাদন থেকে চিরতরে দূরে হটিয়ে দেবে?

এ প্রশ্ন শিল্পবিপ্লবের উন্মেষকালেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উঠেছিল। সিসমন্ড দ্য সিসমন্ডি (১৭৭৩-১৮৪২) এও বলেছিলেন—যে এভাবে চলতে থাকলে বৃটিশ রাজার অধীনে প্রজা বলতে থাকবে কতগুলো মেশিন। আর কেউ না।

ইতিহাস মুচ্‌কী হেসেছে এই ধরনের আপ্তবাক্য বা অতিকথনে। সিসমন্ডি প্রোলেটারিয়াত সম্পর্কে অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন। যারা অটোমেশনের ভূত দেখেছিলেন একসময় তারাও এই ভুল করেছেন।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যত মানুষ সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতো তার থেকে বহুগুণ বেশী মানুষ আজ বিশ্বজুড়ে সামাজিক উৎপাদনে নিযুক্ত। আবার সারা বিশ্বে জনসংখ্যা এবং মানুষের বেঁচে থাকার বয়সও বেড়েছে। তবুও সিসমন্ডির ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত পেটি-বুর্জোয়া ভ্রান্তির প্রকোপ প্রায়ই দেখা দেয়।

বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা মনে করেন প্রযুক্তিগত বা শ্রমদানের উপকরণের উন্নতি শ্রমিককে কেবল কোণঠাসা করে পেছনে হটিয়ে দেয় এবং তারা ক্রমশ উৎপাদনের সক্ষমতা হারায়। মেশিন-ই সব। অর্থাৎ মেশিনের মধ্যে যে অতীতের শ্রম এবং প্রযুক্তি জ্ঞান নিহিত আছে সেটাই সজীব শ্রম, যা' শ্রমিককে অবদমিত করে। অর্থাৎ ইতিহাস বর্তমানকে অবদমন করে।

এরা বোঝে না যে প্রযুক্তি বিকাশ ও বিপ্লবের সাথে সাথে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে আরও সক্ষম হয়ে ওঠে। লেনিন এক্ষেত্রেই বলেছিলেন ওই ১৯১৮ সালের বক্তৃতায়—

...understanding this truth lies the whole complexity and whole strength of Marxism. [CWG-Lenin Vol-27 pp 411]

অতএব, অনৈতিহাসিক চিন্তার ফলে এই পাতিবুর্জোয়া ধারণা তৈরী হয় যে মানুষকে বাদ দিয়ে উৎপাদন সম্ভব।

(৫)

জেনারেল মোটরস, ICI-র মত দানবীয় কর্পোরেটদের পেছনে ফেলে উপরে উঠে এসেছে Microsoft, Google, Amazon. অর্থাৎ মুনাফা তৈরীর ক্ষেত্রেও অতীত শ্রম এবং জ্ঞান-এর থেকেও আধুনিক প্রযুক্তি হারাহারিভাবে অনেক বেশী এগিয়ে। অতীত বর্তমানকে অবদমিত করছে না। মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন যে অতীত শ্রম ও জ্ঞান নিহিত উপকরণের অবমূল্যায়ন বা ক্ষয় (depreciation)-এর হার অনেক বেশী। অনেক সময় ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী করতে হয়।

হাওড়ার তেলকল ঘাটের সামনে দেখতে পারেন দৈত্যাকার BURN Co.-এর ভগ্নস্তূপ দাঁড়িয়ে আছে। এই Capital anihilation ক্যাপিটাইজেশন মার্কস স্পষ্ট দেখিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে Schumpeeter-এর আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন।

(৬)

তাহালে বাধাটা কোথায়? আমরা এটা সকলেই বুঝি যে প্রযুক্তিবিপ্লবের পরেও মানুষই সমাজের মূল উৎপাদিকা শক্তি। যারা মনে করেন যে cybernetic সমাজে শ্রমজীবি মানুষের প্রয়োজন আর থাকবে না, তাদের অভয়ারণ্যে দ্রষ্টব্য করে রাখতে হবে—এর মাধ্যমে তাঁরা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে মানুষ আর যন্ত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে। অন্যদিকে এরা জ্ঞান ও মানুষের নতুন করে সম্পদ ও সম্পর্ক তৈরীর সক্ষমতাকে অস্বীকার করতে চায়।

তাই মূল বাধাটা বোঝাতে গিয়ে লেনিন তার ছোট্ট প্যামফ্লেট Barbarian Capitalism -এ বলেছেন—

on all sides, at every step one comes across problems which man is quiet capable of solving immediately, but capitalism is in the way. It has a massed enough wealth and make men the slaves of wealth. It has solved the most complicated technical problems—and has blocked the application of technical improvements because of poverty and ignorance of millions of population, because of the stupid avarice of a handful of millionairs.

জ্ঞান প্রযুক্তি যা কিছু হিতকারী ফলাফল, তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হল মানুষ—কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবস্থার বা কর্পোরেটের নয়। জ্ঞান-এর প্রকৃতিই হল মুক্ত হওয়ার, ছড়িয়ে পড়ার। জ্ঞানভান্ডারের খোঁজ ও গবেষণা তাই কর্পোরেটরা চাপিয়ে দেয় রাষ্ট্রের ওপর। সে অন্তরীক্ষ, মঙ্গল অথবা চন্দ্র অভিযান—যাই হোক। কারণ ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজি বুঝতে পারে না যে জ্ঞানান্বেষণে কোটি কোটি টাকা লগ্নি করে হাতনাতে ফায়দা বা মুনাফাটা কী উঠে আসবে বা মুনাফা আদৌ হবে কি না? বরং জনগণের করের টাকায় রাষ্ট্র তা খরচ করুক। তারপর অর্জিত জ্ঞান থেকে যে ফায়দা তা তোলা যাবে। কারণ রাষ্ট্র সেই জ্ঞানের সুলুকসন্ধান জানাবে কেবল একচেটিয়া কর্পোরেটকে। জনসাধারণকে নয়। অথচ জ্ঞান অন্বেষণ হল জনগণের টাকায়, কিন্তু জনগণের কোন অধিকার নেই। এই ব্যবস্থা, আজকে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, একদিন দাস ব্যবস্থার মতো ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত

হবে। সামান্য শ-দুয়েক বছর আগে, দাসবাজারে মানুষ কেনাবেচা হত। আজ আমরা তা অবাক হয়ে ভাবি। কী করে এটা সম্ভব ছিল ভেবে পাই না। দু'শো বছর আগে সেটা খুব স্বাভাবিক ছিল। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ দেখিয়ে ছিলেন ভারত থেকে দলে দলে indentured Labour-দের কীভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ জাহাজ-এর খোলে ভরে পাঠানো হ'ত।

বর্তমানে এই কর্পোরেট-রাষ্ট্রের নৈতিক সম্পর্ক এবং অশুভ আঁতাতকে উন্মোচন করা জরুরী। গোটা ব্যবস্থাটা কেবলমাত্র শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে না দেখলে বা ব্যাখ্যা করলে স্পষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে লেনিন আমাদের চিরকালের শিক্ষক, মহান পথপ্রদর্শক।

(৭)

দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে সোভিয়েত দেশ লেনিনের এই শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। ১৯৫০-এর অনেক পরে ১৯৬৮-তে লিওনিড ব্রেঝনেভ CPSU-র ২৪তম কংগ্রেস-এ প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে তার কী প্রভাব তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ততদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বহু পথ এগিয়ে গেছে। ১৯৬৯ সালে মস্কোতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টির সম্মেলন হয়। এর আগে ১৯৬০ সালে এরকম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছল। সে সম্মেলন থেকে বিখ্যাত ৮১ পার্টির দলিল গৃহীত হয়। ১৯৬৯ সালের সম্মেলনে বলাইবাহুল্য চীন, কোরিয়া যায়নি। আমাদের দেশ থেকে কেবল একটা কমিউনিস্ট পার্টি গিয়েছিল। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির তখন বহুধা বিভক্ত। যাইহোক এ রচনাতে এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনার সুযোগ বর্তমান।

১৯৬০ সালের সম্মেলন গোটা ষাটের দশককে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগ হিসাব পরিগণিত করেছিল। ১৯৮৯-৯৩ সোভিয়েত-এর পতন বহু dogma এবং ভ্রান্তিকে উন্মোচন করেছে। প্রযুক্তি বিপ্লব সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৫০-৬৯ প্রায় উনিশ বা তার বেশী বছর দেরী হল বুঝতে। একটি বাউল গানের অতিপ্রচলিত লাইন আছে—'সময় গেলে সাধন হবে না'।

সেই অমূল্য সময় চলে গেল। চীন আবার তাদের ৯ম পার্টি কংগ্রেসে **সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদের** দ্বন্দ্বের Binary ছেড়ে traid-এর ফর্মে মৌলিক দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা করলো—**সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বনাম বাম সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্র**—এই অভিধায়।

সে এক অস্থির সময়। রুশ বিপ্লবের ৫০ বছর ধরে CPSU-র প্রযুক্তি-বিশ্ব সম্পর্কে যে বোধের উদ্রেক হয়েছিল শুধু তাকে সম্বল করে অধঃপতন ঠেকানো যায়নি। গর্বাচেভ ইয়েলেৎসিনরা Politburo অবধি স্থান করে নিয়েছিল।

বস্তুজগতে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতির ফলে সমাজ সম্পর্কে কী প্রভাব পড়ে তার ক্রমাগত বিশ্লেষণ থেকে নিজের চোখকে আড়াল করলে কী মারাত্মক দাম দিতে হয়, তার প্রকৃত উদাহরণ সোভিয়েত ইউনিয়ন। যে দেশ স্ট্যালিনের মত মানুষের নেতৃত্বে হিটলারকে পরাস্ত করেছে সেই দেশ গোরবাচেভ ইয়েলেৎসিনদের ঠেকাতে পারলো না। শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে এতোবড় বেইমানি আর ইতিহাসে নেই।

'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটির উল্লেখ না করে এই প্রসঙ্গে ইতিটানা সম্ভব নয়। ১৯১৭ সালে আত্মগোপন অবস্থায় লেনিন এই লেখাটি লেখেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে। তখন তিনি রাষ্ট্রনায়ক। মার্কস এঙ্গেলস রাষ্ট্র নিয়ে বহু জায়গায় আলোচনা করেছেন। কিন্তু, নির্মোক সরিয়ে নিলে রাষ্ট্র যে কেবল শ্রেণিশোষণের হাতিয়ার এই স্পষ্ট সহজ সরল ব্যাখ্যার লেনিনই প্রথম সহজপাঠ করিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর কোন একটি বইকে যদি উল্লেখ করতে

হয় যা সব থেকে বেশী প্রভাবিত করেছে গোটা বিশ্বকে তা হল **'State and Revolution'**.

বিপ্লবের পরে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। অবলুপ্ত (withering) হওয়ার কথা। কিন্তু লেনিনই দেখিয়েছেন যে বিপ্লবের পরেও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় অবধি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকতে হবে। শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং তা নিয়ে লেনিনের মৃত্যু অবধি এবং তার পরে অনুগামীদের রাষ্ট্রপরিচালনা নিয়ে এবং সর্বশেষ বলশেভিক বিপ্লবের পতন পর্য্যন্ত (১৯৯২) যে সকল দার্শনিক প্রবলেম উঠে এসেছে তা নিয়ে স্টালিন সহ বহু চিন্তাবিদ গবেষণা করেছেন। সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। কিন্তু বিপ্লবের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে জড়িয়ে আছে বলপূর্বক রাষ্ট্রযন্ত্রের দুটি অঙ্গ—যথাঃ আমলাতন্ত্র এবং সেনাদলের সম্পূর্ণ উৎখাত। বলশেভিক রেড আর্মি গঠন করেছিল শ্রমজীবি মানুষ, কৃষক সমাজ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সৈনিকদের নিয়ে।

অক্টোবর ১৯১৭-র আগে ফেব্রুয়ারীতে আর একটি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। তাতে জার-এর পতন হয় এবং মেনশেভিকরা ক্ষমতায় আসে। শান্তি এবং সোভিয়েতের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এই দাবী নিয়েই বলশেভিকরা লড়ে গিয়েছিলেন। ফলে কারখানায় রুশ সোভিয়েত অনেকটা আমাদের পঞ্চায়েতের আদলে তৈরী হয়েছিল। সরকার এবং সোভিয়েত এই দুই ক্ষমতা কেন্দ্র তৈরী হয়েছিল যা অক্টোবর বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল। প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলা চলে যে লেনিনের ৩৮ খণ্ড অধ্যয়ন সম্ভব না হলেও দুটি রচনা **State and Revolution** এবং **What is to be done** (কী করিতে হইবে) এই দুখানি লেখা যে কোন শ্রমিকশ্রেণির মুক্তিকামী মানুষকে বুকে আগলে পড়তে হবে—বারবার পড়তে হবে।

শুধু লেনিন পুজো নয়। লেনিনের মতামতকে উপেক্ষা করা বা প্রতিনিয়ত অনুশীলন পাঠ ও পুনঃপাঠের মধ্যে না রাখলে আজকের দুনিয়াকে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অপরদিকে শ্রেণি চেতনাহীন ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। তা কেবল হতাশাই বাড়ায়।

Marx, Engles, Lenin আরও অনেক অনেক দিন তাদের চিন্তাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মানুষের এই বিপন্নতায় মুক্তিপথের পথ নির্দেশ করবে। লেনিনের দেড়শতম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শত কোটি প্রণাম।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হ'ক। ❐

তথ্যসূত্র :

1. Collected Works : Lenin Vol 19, 27.
2. Reminiscence of Marx and Engles : W. Leibnecht.
3. Development of Revolutioanry Theory of CPSU.
4. IMCWP 1969 Documents.
5. 9th Party Congress, Documents Communist Party of China.
6. Capilalism, Socialism and Democracy–J.A. Schumpeter.

জন্মশতবর্ষের আলোয় সোমেন চন্দ

প্রণব দত্ত

গত শতকের তৃতীয় দশকের শেষদিক। ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরে আলাপচারিতায় মগ্ন দু'জন মানুষ। একজন বয়স তাঁর চল্লিশের কোঠায় আর একজন কৈশোর থেকে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত এক তরুণ। কথা হচ্ছে চারপাশের পৃথিবী, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম, সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী, প্রগতি পথের অভিযাত্রীদের মরণপন লড়াইয়ের বিষয়। সেই সময় স্পেনের বুকে ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে সামিল হয়েছেন দেশের মানুষে, তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন শিল্পী-সাহিত্যিক-সমাজকর্মীদের 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড', মহৎ মানবিক প্রেরণায় উদ্দীপ্ত আন্তর্জাতিক চেতনার সে-এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। সেদিনকার সেই তরুণ সোমেন চন্দ সম্পর্কে—আলাপচারি প্রবীণ ব্যক্তিটি অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় কমিউনিস্ট নেতা সতীশ পাকড়াশী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন—'মহৎ কর্মপ্রেরণায় আত্মদান বৃথা যায় না। বিশ্বমানবের কল্যাণে-ইংলন্ডের তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক রালফ্ ফক্স-এর আত্মদান গণ-মানবের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বছর চারেক আগের কথা। ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে বসে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাই হচ্ছিল। আগ্রহভরা গভীর প্রাণে সোমেন ভাবছিল,—স্পেনে জনগণের জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—আন্তর্জাতিক বাহিনী—ব্রিটেনের গণ-সাহিত্যিক, ব্রিটেনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট রালফ্ ফক্সের স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান—স্পেনের জনগণের ধনসম্পদের মালিক ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম—বিদেশী কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও রাজনীতিক কর্মীদের জীবন উৎসর্গ—এইসব টুকরো টুকরো কথাগুলি একত্রে মিলিয়ে সোমেনের মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হলো। সোমনে জিজ্ঞাসুভরা প্রাণে বলে উঠলো—সাহিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লো? আমি বললাম: অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারী ধরতে হয়—বুকের রক্তে তখন নূতন সাহিত্য তৈরী হয়। ধন-শোষণ মদমত্ত ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিল। সাহিত্য সাধনায় লাঞ্ছিত গণ-মানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তোলার যে প্রেরণা সেই লেখককে গণ-মানবের মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সোমেন চুপ করে শুনে একটু পরে বললো, 'এঁরাই সত্যিকারের সাহিত্যিক'।" [পরিশিষ্ট: সোমেন চন্দ/ 'অগ্নিযুগের কথা—সতীশ পাকড়াশী]

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের (পরে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ') উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সোমেন চন্দ স্মৃতিসভার বক্তৃতারূপে সতীশ পাকড়াশী যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন পরে তা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তাঁর 'অগ্নিযুগের কথা' গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশে স্থান পায়। তিনি ঐ বক্তৃতার উপসংহারে পৌঁছে বলেছিলেন—'বিপ্লবী সোমেন কমিউনিস্ট সোমেন, ভারতের স্বাধীনতাকামী সোমেন ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে আন্তর্জাতিক জনযুদ্ধের বীর সৈনিকরা যে ২২ বছর বয়সে আত্মজীবন উৎসর্গ করে গণ-মানবের উদ্বুদ্ধ চেতনাকে সংগ্রামমুখী

করে রেখে গেল। তার অস্পষ্ট, অর্ধস্ফুট, সাহিত্য ফুটে উঠবে, স্পষ্ট হয়ে উঠবে নতুন বিপ্লবী সাহিত্য-নিপীড়িত গণ-মানবের মনবেদনার দুর্জয় হিংসার অভিব্যক্তিতে।'

রক্তের অক্ষরে লিখিত বিপ্লবী প্রাণের মহৎ আত্মবলিদানের এই গাথা যেন ধরা রইলো সোমেন চন্দের নিজেরই লেখা এই কবিতায়—

রালফ ফস্কের নাম শুনেছ?
শুনেছ কডওয়েল অর কর্ণফোর্টের নাম?
ফেদারিকো গার্সিয়া লোরকার কথা জানো?
এই বীর শহীদেরা স্পেনকে রাঙিয়ে দিলো,
মার-র বুক হলো খালি—
তবু বলি সামনে আসছে শুভদিন।
চলো আমরাও যাই ওদের রক্তের পরশ নিতে,
ঐ রক্ত দিয়ে লিখে যাই
শুভদিনের সঙ্গীত।

শুভদিনের স্বপ্নদেখা এই তরুণ বিপ্লবী ফ্যাসিবাদী হামলায় শহীদের মৃত্যুবরণ করার পর 'পরিচয়' পত্রিকায় এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, যা মহৎ প্রাণের আত্মবলিদানের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য—'লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর পটভূমিকায় একটি মাত্র লোকের মৃত্যু তুচ্ছ ব্যাপার মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষ পরিবেশে একজনের মত্যু বহু মৃত্যুর চাইতে বেশি অর্থবহ হতে পারে। সোমেন চন্দের মৃত্যু এই জাতীয়।' জন্মশতবার্ষিকীর আলোয় সোমেন চন্দের জীবনকৃতি স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে—আমরা তাঁর জীবনে অনিবার্য দীপশিখার মত উজ্জ্বল সেই প্রেরণার উৎসবিন্দুটিকে স্পর্শ করতে চাই, 'আগুনের পরশমণি'-র স্পর্শ পেতে চাই আমাদের বিবশ চেতনায়।

(২)

সোমেন চন্দের জন্ম ১৯২০ সালের ২৪শে মে অবিভক্ত বাংলার নরসিংদী জেলায়। তাঁর মা হিরণবালা সোমেনের যখন মাত্র চার বছর বয়স, তখনই প্রয়াত হন। পিতা নরেন্দ্রকুমার চন্দ ঢাকার মিডফোর্ড মেডিকাল স্কুল-এ স্টোর্স বিভাগে কাজ করতেন। তিনি স্ত্রী বিয়োগের পর শিশু সোমেনের প্রতিপালনের কারণেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণ করেন সরযূদেবী বা সরোজহাসিনীকে। ইনিই ছিলেন সর্বার্থে সোমেন চন্দ-এর জননী। গ্রাম ভিত্তিক পরিবারটি শহরে চলে এলেও পারিবারিক বৃহত্তর পরিমণ্ডলটি ছিলো খুবই আন্তরিকতাস্নিগ্ধ। সোমেনের দুই বোন ও এক ভাই ছিলেন পরিবারে। এছাড়া জ্যাঠার পুত্রকন্যা, ঠাকুমা, মাসি সহ বিরাট সে সাংসারিক বৃত্ত। তাঁর পূর্বপুরুষ ও মামাবাড়ি ঢাকা জেলার গ্রাম অঞ্চলে থাকলেও ঢাকা শহরই ছিল সোমেনের আশৈশব কর্ম ও মর্মভূমি।

১৯৩৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে সোমেন চন্দ ঢাকার মিডফোর্ড মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেও ডবল নিমোনিয়া সংক্রমণে আর পড়াশোনা চালাতে পারেননি। তাঁর মন এইসময় অন্যদিকেও ঝুঁকেছিল। বই পড়ার আগ্রহ তাঁর বাল্যকাল থেকেই। ঢাকার জোড়াপুল লেনের 'প্রগতি পাঠাগার'-এ স্কুল জীবন থেকেই ছিল তাঁর আনাগোনা। সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষদের দ্বারা পরিচালিত এই পাঠাগারটিই সোমেন চন্দের প্রাথমিক রাজনৈতিক চেতনা তৈরি করে দিয়েছিল। এর সাথে ছিল লেখার ঝোঁক। ১৯৩৭ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সোমেন চন্দর প্রথম গল্প 'শিশু তপন'। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ম্যাক্সিম গোর্কি, মোপাঁসা, রোঁমা রঁলা, আঁরি বারবুস, আন্দ্রে জিদ, মারলো সহ দেশবিদেশের বহু সাহিত্যিকের কাজের সঙ্গে

তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে অল্প বয়সেই। ১৯৩৭ সালে তিনি সরাসরি সাম্যবাদী আন্দোলনে যোগদান করেন। এই মতাদর্শের হাতেখড়ি হয়েছিল যেখান থেকে সেই প্রগতি পাঠাগারের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন ঠিক পরের বছর।

১৯৩৭-১৯৪২ পর্যন্ত সোমেন চন্দের সাহিত্যসৃষ্টি ও রাজনীতিচর্চা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছিল। 'ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ' নামক একটি দলিল-গ্রন্থে (বইটি লিখেছেন ঢাকার কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী, যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতা মনি সিং ও ঢাকার অন্যতম কমিউনিস্ট নেতৃত্ব 'সাম্যবাদের ভূমিকা'র লেখক অনিল মুখার্জী) সোমেন সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'তিনি মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং গভীরভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। মার্কসবাদ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মে যে, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইতে না পারিলে কোনো সত্যিকার প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি ১৯৩৯ সালে রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কাজ করিতে থাকেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রমিকদের অতি আপনার জন হইয়া দাঁড়ান।

১৯৪০ সালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্যদের সঙ্গে তরুণ সাহিত্যিক এই সংগঠনে যোগ দেন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে সোমেন চন্দ ইহার প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। সোমেন চন্দ সেই সময়েই এখানকার সাহিত্যিক মহলে বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।' ১৯৪১ সালেই তিনি দায়িত্ব পান ইস্টবেঙ্গল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদকের। ১৯৪০ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় ২০ জন প্রগতিবাদী সাহিত্যিকের রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয় ১৬০ পাতার 'ক্রান্তি' নামক একটি কালজয়ী সংকলন, যা ছিল বাংলা প্রগতি সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

(৩)

মাত্র বাইশ বছরের জীবনে সোমেন চন্দ তাঁর সাহিত্য সৃজনপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন ২৬টি ছোটগল্প, একটি উপন্যাস, কবিতা, নাটিকা আর জীবনচিন্তা স্পন্দিত পত্রগুচ্ছে।তাঁর জীবনমন্থনজাত সৃজনকর্মে কোন 'শৌখিন মজদুরি' ছিল না 'জীবনে জীবন যোগ করার' মধ্যে দিয়েই সার্থক হয়ে উঠেছিল তাঁর সৃষ্টি। 'কৃত্রিম পণ্যের পশরা' হয়ে ওঠার বদলে তাই তা কালজয়ী অভিঘাত তৈরি করতে পেরেছে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায়।

তাঁর বিখ্যাত একটি ছোটগল্প 'ইঁদুর' সম্পর্কে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছিলেন: 'সোমেন চন্দ বিশের কোঠায় পা দিতে না দিতে ঘাতকের ছোরার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তখন আমি আমাদের বে-আইনি পার্টির সভ্য হিসাবে গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। সোমেন চন্দের নাম জানা ছিল, কিন্তু তাঁকে কখনও দেখিনি, কিংবা তখন তাঁর কোনো লেখা পড়িওনি। পার্টি যখন আইনসম্মত হলো তখন বাইরে এসে সোমেন চন্দের লেখা 'ইঁদুর' গল্পটি প্রথম পড়লাম। আমার মন তখন হাহাকার করে উঠলো। হায় হায়, এমন ছেলেকে রজনীতিক মন কষাকষির জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেরে ফেললো! সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে একটি বিরাট স্তম্ভ গড়ে তুলতে পারতেন। তাঁর ছোটোগল্প 'ইঁদুর'-এর ইংরেজি তর্জমা করেছেন শ্রী অশোক মিত্র, আইসিএস। এই গল্প পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক তা পড়েছেন। 'ইঁদুর'-জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প।'

সোমেন চন্দের 'সংকেত' গল্পটি শ্রমিক-কৃষক সংগ্রাম ও ঐক্যবোধের এক অপরূপ শৈল্পিক নিদর্শন। গল্পটি প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাম্যবাদী লেখক গোপাল হালদার লিখছেন: 'বাইশ বছরের যুবক কি করিয়া জানিল এই জীবনের সংকত? ইহাতো শুধুমাত্র তাহার সত্তার সংকেত নয়। ইহা যে তাহার অচেতন সহযাত্রীদেরও জীবনগাথা, তাহাদেরও

জীবনের সংকেত।' শ্রেণীচেতনায় প্রোজ্জ্বল এই ছোটগল্পে শ্রমজীবী মানুষের মহত্তর মানবিক ঐক্য ও সম্প্রীতির এক অন্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

তাঁর 'দাঙ্গা' গল্পটিকে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সম্পর্কিত অনতম শ্রেষ্ঠ বাংলা ছোটগল্প বলে অনেকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। গল্পটির নায়ক অশোক কমিউনিস্ট। সে তার 'হিন্দু সোশ্যালিস্ট' ছোটো ভাই অজয়কে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ক্ষতিকারক ও অমানবিক দিকগুলির কথা বোঝায় কিন্তু অজয় বোঝে না। শহরের নানাদিক থেকে ভেসে আসে ছোটো ছোটো খবর, তৈরি হয় টুকরো টুকরো দৃশ্য। টেনশন ক্রমশঃ টানটান হয়ে উঠতে থাকে। পলিটিক্যাল ইডিয়োলজি আর মানুষের মনঃপ্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রণে গল্পটি একটি টানটান রাজনৈতিক গল্প হয়ে উঠতে পেরেছে। গল্পটি শেষ হয় কোনো নাটকীয়তায় নয়; পথে রক্ত পড়ে আছে দেখে অশোকের মনের একটি অনুভবে—'কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে?' যার রক্ত সে হিন্দুও হতে পারে অথবা মুসলমান—সাম্প্রদায়িক বিরোধের এই নিরর্থক রক্তপাতের দিকে ইঙ্গিত করে জীবনবোধ ও শিল্পরূপের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে উপসংহারে পৌঁছোয় 'দাঙ্গা'। ১৯৪১ সালে লেখা এই গল্পে আতঙ্ক, সন্ত্রাস আর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিপ্রসূত রাজনীতি, ফ্যানাটিসিজমের যে-স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা ২০২০-২১শের ভারতবর্ষের পটভূমিতেও নতুন করে উস্‌কে দিতে পারে আমাদের সাম্প্রত ভাবনার পরিমণ্ডলকে।

তাঁর একটি মাত্র প্রকাশিত উপন্যাস 'বন্যা'-তেও শিল্পসিদ্ধির পরিচয় রেখেছেন তরুণ সোমেন চন্দ। বানভাসি একটি গ্রামের পটভূমিতে একটি জলমগ্ন পরিবারের কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই উপন্যাসে; পাত্রপাত্রীরা সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। মধ্যবিত্তের সংকটের স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ার পাশাপাশি তা থেকে মহৎ মানবিক উত্তরণের ইশারাই ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। কাহিনী অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখি, মেঘ অন্ধকার বন্যার বর্ণনার থেকে পাঠককে তিনি সরিয়ে নিয়ে চলেছেন 'সোনার বরণ জলদেবতা' অর্থাৎ আলোয় মোড়া লাল টুকটুকে দিনের দিকে। নির্মাণ কুশলতার দিক থেকেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর আরো অনেক গল্পই আমাদের আজো চমকিত করে যেমন: 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন', 'রাত্রিশেষে', 'স্বপ্ন', 'একটি রাত', 'বনস্পতি', 'রাণু ও স্যার বিজয়শঙ্কর' প্রভৃতি।

সোমেন চন্দের অগ্রজপ্রতিম রণেশ দাশগুপ্ত, ঢাকার সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম শ্রদ্ধেয় নেতৃত্ব তাই সোমেনের সৃজনী প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই লিখেছেন: '...তাঁর লেখার পাকা গাঁথুনির কথাই মনে পড়ছে। একটা আবেগের মুহূর্তে তর তর করে লিখে ফেলা সোমেনের স্বভাব ছিলনা। এক একটা গল্পের রয়েছে দিন-রাত্রির চিন্তা। ...এই খোঁজটা যারা রাখেন না, তারা শুধু অবাক হয়ে ভাবেন। এই অল্প বয়সেলেখার এমন পাকা গাঁথুনি কোথা থেকে এল। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, সোমেন ছিলেন লেখার শ্রমিক, অসাধারণ পরিশ্রমী শ্রমিক। সেইজন্য তাঁর ছোটো-খাটো লেখাও ঠুনকো নয়। বাজে লেখা প্রায় নেই বললেই চলে। সঙ্গে সঙ্গে লেখকরা হচ্ছেন **'মানবাত্মার ইঞ্জিনিয়ার'**—স্তালিনের এই কথাটি সোমেন চন্দের উপর আরোপ করা যায়।' [প্রতিরোধ—সোমেন চন্দ স্মৃতিসংখ্যা ১৩৫০]

'শিল্পের জন্য শিল্প' এমন মতে তাঁর ভরসা ছিল না, এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে সোমেন জানাচ্ছেন—'লেখার জন্য একটুও সময় পাই না। তবু লিখতে হবে মেহনতী মানুষের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য...। র‍্যালফ ফক্‌সের বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। ...এই না হলে কি মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায়?' সেই পথেই ধাবিত হয়েছিল তাঁর শিল্পসৃষ্টি—যে বৈপ্লবিক চেতনা থেকে কলম সচল হত তাঁর, সেই অন্তঃস্থিত প্রেরণার তাগিদ অন্তরে অনুভব না করতে পারলে সোমেন চন্দ-এর সাহিত্যকৃতির সম্যক অনুধাবন সম্ভব নয়। তরুণের স্বপ্ন চোখে আঁকা

সোমেন একদা নিজেই জানিয়েছিলেন— '...আর এই বিপ্লবের অনুভূতি কেবল আমার নয়। আরও অনেক সাহিত্য-সেবকের মনেই জেগেছে মনে হয়, তার মধ্যে অনেকেই প্রকাশ করতে পারছে না বা কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে গেছে সাহিত্য ডিক্টেটরদের গোলমালে কিন্তু সেই অনুভূতির অস্তিত্ব আছে অনেকের মনেই। এসব দেখে মনে হয় বিপ্লবের জন্য একজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা করো, শৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই।' (নির্মল ঘোষকে লেখা চিঠি)

আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত সোমেনের সৃষ্টিকর্মে বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর চিন্তাভাবনার, বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী চেতনার স্ফূরণের এক অমিত সম্ভাবনা ও সিদ্ধির উজ্জ্বল দিক্‌চিহ্ন রূপে তিনি জেগে রয়েছেন।

(৪)

তারিখটা ছিল ৮ই মার্চ ১৯৪২। এইদিন প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতকের নৃশংসতায় মাত্র বাইশ বছর বয়সে নির্বাপিত হয় সোমেন চন্দের জীবনদীপ। বড়ো উত্তাল এই কালপর্বে একদিকে ইতিমধ্যে বেজে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা, পৃথিবীর বুকে এক 'অদ্ভুত আঁধার' নামিয়ে আনছে ফ্যাসিবাদী শক্তি, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হিটলারের নাৎসী বাহিনীর হাতে। সারা বিশ্বের মানুষ তাকিয়ে আছেন সভ্যতার শত্রু ফ্যাসিস্ত শক্তিকে রুখে দেবার জন্য মরণপণ লড়াইয়ে ব্যস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথও খোঁজ নিচ্ছেন রাশিয়ার প্রতিরোধী লড়াইয়ের। সোভিয়েত বাহিনীর সাফল্যের সংবাদ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলছেন— 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে, ওরাই পারবে।' এমতাবস্থায় ভারতে গড়ে ওঠে 'ফ্রেন্ডস অব সোভিয়েত ইউনিয়ন।' ঢাকায় এই সংগঠনের বিস্তারেও অগ্রণী ভূমিকা নেন সোমেন চন্দ। এই 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'-র ঢাকা শাখার উদ্যোগে রাশিয়ার নতুন সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি বিষয়ে সপ্তাহব্যাপী একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সোমেন চন্দ। ঐসাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সমিতি ৮ই মার্চ, ১৯৪২ তারিখে আয়োজন করেন 'ঢাকা জিলা ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলন'-এর, ঢাকার সূত্রাপুর বাজারের কাছে সেবাশ্রমের মাঠে সেই সম্মেলনে কলকাতা থেকে যোগ দিয়েছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, স্নেহাংশু আচার্য, জ্যোতি বসু প্রমুখ নেতৃত্ব। সম্মেলন বানচাল করতে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা (সেই সময়কারহিটলার সমর্থক) বারবার সশস্ত্র আক্রমণ করে। ওরা ব্যর্থ হয়ে যায়। ঐ সময় সোমেন চন্দ রেল শ্রমিকদের একটি শোভাযাত্রা নিয়ে সম্মেলনে যোগ দিতে আসছিলেন। সম্মেলন বানচাল করতে ব্যর্থ আক্রমণকারীরা এই শোভাযাত্রা আক্রমণ করে এবং নৃশংসভাবে সোমেন চন্দকে হত্যা করে। ওরা তাঁর চোখ উপড়ে নেয়, ডান্ডা মেরে মাথা ভেঙ্গে দেয়। পেটে ছুরি চালিয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করে দেয়। এইভাবে লেখক ও মেহনতী মানুষের নেতা সোমেন চন্দ শহীদের মৃত্যুবরণ করেন, মাত্র ২১ বছর ৯ মাস ১৫ দিনের বিপ্লবী জীবনের অবসান ঘটে অপরাজিত জীবনের প্রত্যয়ী বিভা ছড়িয়ে। কবি বিষ্ণু দের ভাষায়—

'অমরপ্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য অসহায় হাতিয়ারে
তুব জানি এই দধীচির হাতে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ কেটে দেব পাতা লিখব বিজয়-ভাষ্য।' (ইতিহাস: বিষ্ণু দে)

'প্রাচীর' শিরোনামে ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়া সোমেনের স্মৃতিতে প্রকাশিত একটি কবিতা-সংকলনে মোট এগারোজন সমকালীন কবির সঙ্গে বিষ্ণু দে-র এই কবিতাটিও স্থান পায়। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রতিবাদ' নামক আর একটি স্মরণীয় কবিতায় লেখা হয়:

'মানুষের যে-মূল্য পরম
তারে করে পদাঘাত যাদের বিক্রম
তাদের দুঃসহ পাপে
তীব্র অভিশাপে
যদি না দহিতে পারি আগ্নেয় ঘৃণায়
যদি না ঝঙ্কারি ওঠে ধিক্ ধিক্ আমার বীণায়
তবে ব্যর্থ কবি জন্ম—মনুষ্যত্ব তাও তবে বৃথা,
পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদে রেখাবে আজ হোক উদ্দীপিতা
আমার কবিতা।'

(৫)

সোমেন চন্দের দধীচিসম আত্মদানের বৈভবে তাঁরই অস্থি-নির্মিত বজ্রেই ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে গড়ে উঠলো 'ফ্যাসি-বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ।' বাংলার ফ্যাসিবিরোধী প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে সঞ্চারিত হলো নতুন গতি ও প্রাণশক্তি। তাঁকে হত্যা করে ফ্যাসিবাদীরা যে আঁধার নামিয়ে আনতে চেয়েছিল—শুভচেতনার প্রান্তরে, তাকে বিদীর্ণ করে উজ্জ্বল নক্ষত্রের দীপ্তি ছড়িয়ে নতুন করে ছড়িয়ে পড়লো আলোর দিন আনার প্রেরণা, দায়বদ্ধতা ও শপথ; কবি ল্যাংস্টন হিউজের ভাষায়—'Between darkness and the dawn/ There rises a red star.'

তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দশক বাদে 'ক্ষতবিক্ষত সেই মৃতদেহ' শিরোনামের এক স্মৃতিগদ্যে অশোক মিত্র লিখছেন: "কিছু কিছু নাম তাদের নিজস্ব বলায় অতিক্রম করে চলে যায়, প্রতীকে পরিণত হয় তারা। তাঁর বীভৎস হত্যার পঞ্চাশ বছর বাদে রক্তমাংসের সোমেন চন্দকে কল্পনা করা তাই প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়, প্রতীকের মুগ্ধতার মৌতাতে আচ্ছন্ন থাকি আমরা।

অথচ রক্তমাংসের মানুষটি তাঁর কর্ম দিয়ে প্রতিজ্ঞা দিয়ে প্রতিভা দিয়ে, তঁর জীবনযাপন দিয়ে সর্বোপরি তাঁর আত্মাহুতি দিয়ে একটি মস্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন বলেই তো প্রতীক হিসেবে তাঁর স্বতঃসিদ্ধতা। ...প্রতীক থেকে প্রেরণা, সেই প্রেরণা থেকে সংঘবদ্ধ মানুষ নতুন ইতিহাস রচনার অকুতোভয় সঞ্চার করেন। ...মানুষ নিজেকে অতিক্রম করে যেতে পারে, নিজের সংস্থানকে পালটে দিতে পারে, পালটে দিতে থাকে সংস্থান থেকেই প্রেরণার নির্যাস গ্রহণ করে, প্রেরণার সঙ্গে নিজের প্রতিভার-প্রতিজ্ঞার জাদুকরী রসায়ন ঘটিয়ে। এ-সমস্ত প্রক্রিয়া নিজের থেকে ঘটে না! ঘটানো হয় বলেই ঘটে, রক্তমাংসের মানুষ ঘটিয়ে থাকেন, রক্তমাংসের মানুষ ইতিহাসের প্রেরণায় পরিণত হন।

সোমন চন্দ নিছক লেখক ছিলেন বলেই ওই পঞ্চাশ বছর আগে জবাই হননি তিনি, কর্মী ছিলেন বলেই মধ্যযুগীয় বর্বর আক্রোশের শিকার হয়েছিলেন। কবিকে, লেখককে, শিল্পীকে নিযুক্ত হতে হবে, অন্যথা তাঁদের প্রতিভা অবাস্তব। সোমেন চন্দ নিযুক্ত করেছিলেন নিজেকে। ...রক্তমাংসের সোমেন চন্দ তাঁর আক্রান্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন নিঃসাড় দেহের উৎসর্গের মধ্যে দিয়ে প্রতীক-প্রেরণার উদাহরণ সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন...। না, ফ্যাসিবাদ শেষ কথা বলে না, গুণ্ডাশাহী শেষ কথা বলবে না, মানুষই মানুষের প্রেরণার উৎস, একজন মানুষের দৃষ্টান্ত দশজন মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। দশজন মানুষের জ্বলে ওঠা আরও একশোজন মানুষকে পথনির্দেশ করে, এমনি করে ইতিহাস গড়ে ওঠে, ফ্যাসিবাদীরা যে-ইতিহাসকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনা, অসাফল্যের যন্ত্রণায় তাঁরা পরবর্তী ষড়যন্ত্রের জন্য নিজেদের তাই তৈরি করে। ...**যদি আমরা সজাগ না থাকি, ফ্যাসিবাদ ফের হয়তো মাথা তুলবে আমাদের**

স্বভূমিতেই, সোমেন চন্দ থেকে সফদর হাশমি পর্যন্ত কাহিনীতে তো একই প্রবহমানতা। সোমেন চন্দ যে প্রেরণা জুগিয়ে দিয়েছিলেন ক্রান্তির লগ্নে আমরা প্রমাণ দাখিল করতে পারব তো তা অনিঃশেষ? অন্যথা ইতিহাস ক্ষমা করবে না আমাদের।"

জন্মশতবর্ষের আলোয় সোমেন চন্দকে স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে আজকের এই ক্রান্তিলগ্নে ইতিহাসের দায় ও উত্তরাধিকার বহন করার যোগ্য করে নিজেদের গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞায় যেন উদ্‌ভাসিত হতে পারি আমরা, সেখানেই আমাদের সোমেন-স্মরণের সার্থকতা। ❐

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা:

১।	সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ	:	সম্পাদনা: দিলীপ মজুমদার। প্রকাশক: মজহারুল ইসলাম, নবজাতক প্রকাশনা।
২।	সোমেন চন্দের স্বনির্বাচিত গল্প	:	সম্পাদনা: কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রকাশক: কল্যাণ চন্দ, সারস্বত লাইব্রেরি।
৩।	সোমেন চন্দ (জীবনী গ্রন্থ)	:	কিরণশংকর সেনগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি।
৪।	অগ্নিযুগের কথা	:	সতীশ পাকড়াশী। র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন।
৫।	ক্র্যাকার, সোমেনচন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা	:	স্মরণ সংখ্যা (পত্রিকা)—সম্পাদনা: গৌরাঙ্গ দাস।
৬।	দেশহিতৈষী, শারদ সংখ্যা, ২০১৯	:	'ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যিক শহিদ বিপ্লবী লেখক সোমেন চন্দ-এর শতবর্ষ': নীতীশ বিশ্বাস।
৭।	ছাত্রসংগ্রাম, শারদ সংখ্যা, ২০১৯	:	'জন্মশতবর্ষে সোমেন চন্দ—আলো-আঁধারের মাঝে এক লাল তারা': অর্কপ্রভ সেনগুপ্ত।

Always use
PUJA Brand Bricks :

M/S PUJA BRICK WORKS

VILL : KAMALPUR
P.O. : RADHAPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST : HOWRAH
PIN : 711301

S.G-10

With Best
Compliments from :

M/S SHIHARI BRICK WORKS

VILL & P.O. : DEOLY
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711301

S.G-11

Always use 'LATA'
Brand Bricks

M/S LATA BRICK WORKS

VILL : AMBERIA
P.O: DEOLY
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711301

S.G-12

Always use
'DURGA' Brand Bricks

M/S Durga Brick Industry

VILL & P.O : DINGAKHOLA
P.S. : SHYAMPUR
DIST : HOWRAH
PIN : 711314

S.G-13

Always use
'SAGAR' Brand Bricks :

M/S SAGAR BRICK WORKS

VILL & P.O. : DINGAKHOLA
P.S. : SHYAMPUR
DIST : HOWRAH
PIN : 711314

S.G-14

Always use
'PARBATI' Brand Bricks :

M/S PARBATI BRICK FIELD

VILL & P.O. : JALLABAJ
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711314

S.G-15

Always use 'SURAJ' Brand Bricks

M/S SURAJ BRICK WORKS

VILL : AYAMA-ALIPUR
P.O: ALIPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711315

S.G-16

Always use
'RURAL' Brand Bricks

M/S Rural Brick Works

VILL. : AYAMA-ALIPUR
P.O. : ALIPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST : HOWRAH
PIN : 711315

S.G-17

Always use
'HILL' Brand Bricks :

M/S HILL BRICK WORKS

VILL. : AYAMA-ALIPUR
P.S. : ALIPUR
DIST : HOWRAH
PIN : 711315

S.G-18

Always use
'MODERN' Brand Bricks :

M/S MODERN BRICK WORKS

VILL & P.O. : BALICHATURI
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711315

S.G-19

Always use 'MITA'
Brand Bricks

M/S MITA BRICK FIELD

VILL : AYAMA-ALIPUR
P.O: ALIPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST: HOWRAH
PIN: 711315

S.G-20

Always use
'DIAMOND' Brand Bricks

M/S Diamond Brick Works

VILL. : DHWAJA
P.O. : ALIPUR
P.S. : SHYAMPUR
DIST : HOWRAH
PIN : 711315

S.G-21

প্যান্ডেমিকের আলোছায়া ও পথের দাবী

অম্লান দে

কোভিড উত্তর পৃথিবী তথা ভারতবর্ষ নিশ্চিতভাবেই পরিবর্তিত হবে। অতিমারীর এই প্রভাব সময়ের মানচিত্রে নিশ্চিতভাবেই বিভাজনের সীমারেখা এঁকে দিয়েছে। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

কোভিড-১৯ বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় মূলতঃ তিনটি অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে।

১। বায়োলজিক্যাল অনিশ্চয়তা **(Biological Uncertainity)**

২। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা **(Economic Uncertainity)**

২। স্বকীয় অনিশ্চয়তা **(Idiosyncratic Uncertainity)**

প্রথম অনিশ্চয়তার কারণ মূলতঃ এই যে, এই মারণরোগের বিরুদ্ধে কোনো নিশ্চিত, পরীক্ষিত, প্রমাণিত চিকিৎসা পদ্ধতি, ওষুধ এবং ভ্যাকসিন এখনও নেই। শারীরিক দূরত্বের মাধ্যমে সংক্রমণের রেখাচিত্র নিম্নগামী করার চেষ্টা হলেও আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে স্বাভাবিক জনজীবন পুরানো ছন্দে ফিরে গেলে সংক্রমণ কী রূপ নেবে তা নিয়ে। ভারতের মতো জনবহুল দেশে ট্র্যাকিং, ট্রেসিং জনসখ্যার নিরিখে অপ্রতুল। তদুপরি উপসর্গহীন রোগী চিহ্নিতকরণের এবং পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল এবং দিশাবিহীন। একই কথা প্রযোজ্য চিকিৎসকের সংখ্যা এবং সুরক্ষা সরঞ্জামের যোগানের প্রসঙ্গে।

প্রথম অনিশ্চয়তা বহন করে আনছে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণ স্বাভাবিক জনজীবন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কবে আবার পুরোদমে শুরু হবে তা ভীষণভাবে অনিশ্চিত।

প্রথম এবং দ্বিতীয় অনিশ্চয়তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিজীবন এবং ব্যাপক অর্থে সমাজজীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে। অবসাদ, আত্মহননের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনই বাড়ছে গার্হস্থ হিংসা, নারী নির্যাতন তথা জাতপাত বা ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানি। মনোবিদরা এর নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে এই অনিশ্চয়তার সঙ্কটকে দায়ী করেছেন।

কোভিড অতিমারী এবং বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। জন বেলামি ফস্টার, মাইক ডেভিস, বর ওয়ালেশের মতো তাত্ত্বিকরা অতিমারীর সাথে পুঁজিবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এই কথা বলছেন, তাঁদের বিভিন্ন রচনায় অতিমারীর উৎস এবং সংক্রমণের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন।

মূলত: তিনটি বিষয়কে এই তাত্ত্বিকরা তুলে ধরেছেন।

প্রথমত: জনস্বাস্থ্যের মৌলিক পরিকাঠামোকে ক্রমাগত দুর্বল করে তোলা এবং জনস্বাস্থ্যেও মুনাফার কারবারীদের অবাধ বিচরণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করতে না চাওয়া, বিশেষতঃ নয়া উদারনীতিবাদের সময়কালে।

দ্বিতীয়ত: পৃথিবী জুড়ে অবাধ পুঁজি, শ্রমিক এবং ব্যবসার রমরমা।

তৃতীয়ত: মুনাফার স্বার্থে Sustainable Development-কে বাতিল করে অনিয়ন্ত্রিত অরণ্যধ্বংস, বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

স্বাভাবিকভাবে প্রথম দুটি বিষয়কে তাঁরা এই অতিমারীর দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ার জন্য দায়ী করেছেন। যদিও এই অনুসিদ্ধান্তগুলি প্রখ্যাত তাত্ত্বিক John Bellamy Foster-এর ''Marx's Theory of Metabolic Rify: Classical Foundations for Environmental Sociology'' দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং একদেশদর্শী বলে বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন। এই বিতর্কের বিশ্লেষণে যাবার পরিসর এখানে নেই। ভবিষ্যৎকালেই এর মীমাংসা হবে যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে।

তবে সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা যে এই অতিমারীর সাথে সম্মুখ সমরের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না তা পরিষ্কার। এমনকি বিশ্বের উপর দাদাগিরি করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থাও ভালো নয়, ২০ শে মার্চ, ২০২০ BBC-র একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়, ''The US has gone from being the World's superpower, to asking nurses to sew their own protective gowns and masks'' (Kay, 2020)

সম্প্রতি Leigh Philips তাঁর ''The Free market Isn't up to the Coroniavirus Challenge'' প্রবন্ধে বলেছেন—''...thesordid fact that, in the absence of requistie profit incentive, the pharmaceutical industry has never been interested in developing medicines and vaccines for such infection disease.'' —ইঙ্গিতটি স্পষ্ট এবং সামগ্রিক অবস্থার প্রতি দিক নির্দেশক।

আমাদের দেশের পরিস্থিতি অনুরূপ বা তার থেকেও খারাপ। পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে আমরা পশ্চাদপদ উন্নত বিশ্বের তুলনায় এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, একই সাথে জনস্বাস্থ্য সম্পর্ক রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটা, সে প্রশ্ন ওঠাটাও অবান্তর নয়। তবে একমাত্রিক ভাবে দেখলে ভুল হবে। এই পাপ সঞ্চিত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কোভিড তাকে বেআব্রু করেছে মাত্র।

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক আকস্মিক এই অভিঘাত সামলাবার মতো পরিকাঠামো, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এই রকম জনবহুল, জনঘনত্ব বিশিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের দেশে ছিল না। কিন্তু বাকি 'ব্যবস্থাপনা' ছিল কি? সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি বা কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো? কয়েক ঘণ্টার নোটিশে লকডাউন ঘোষণা এবং তার প্রতিক্রিয়া ভাবা হয়েছিল? ভাবা হয়েছিল প্রান্তিক মানুষদের কথা? আমদানিকৃত রোগ প্রতিরোধের জন্য বিদেশী উড়ান দেশের মাটিতে নামতে দেওয়া অনেক আগে আটকালে কি এত আর্থসামাজিক বিপর্যয় আটকানো যেত না?—প্রশ্নগুলি স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসছে।

মনে পড়ছে জামলো মাকদামকে, মধ্যপ্রদেশের ১২ বছর বয়সী কিশোরী মেয়েটির কথা, যে দারিদ্রের সাথে লড়াই করতে তেলেঙ্গানার লঙ্কাক্ষেতে ২০০ টাকা দৈনিক মজুরিতে কাজ করতে গিয়েছিল, ২৩শে মার্চের পর সে জানতো না খাবার কোথায় পাবে? ফিরতে চেয়েছিল সে পরিবারের কাছে, ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পাড়ি দিয়েছিল বাড়ি ফিরবে বলে। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল বাড়ির থেকে কয়েক ঘণ্টা দূরের রাস্তায়। মনে পড়ছে রক্তাক্ত রুটির ছবি। মনে পড়ছে ১৭৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক যারা মারা পড়েছেন রাষ্ট্রের কাছে নগণ্য হওয়ার অপরাধে(!), দুর্ভগ্যজনক হলেও সত্য যে পরিযায়ী শ্রমিকদের সঠিক পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্র কোনো সরকারের কাছেই ছিল না। ভাবতে হবে ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি, SWAN-এর ২০২০ রিপোর্ট অনুযায়ী এঁদের ৯৬ শতাংশ সরকারের থেকে রেশনের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী বা অর্থ কিছুই পান নি, ৯০% মানুষ পাননি লকডাউনের ১ মাসের মজুরি। কারণ সরকার বাধ্য করতে পারেনি। বর্তমান পুঁজি নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থায় সেই বাধ্যবাধকতা তৈরি করা যায় না কারণ পুঁজিপতিরা কখনই সরকারের এই হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না। তাদের চাহিদা সরকার তাঁদের একক স্বার্থানুসারী নীতি প্রণয়ন করুক এবং তা সফলভাবে বাস্তবায়িত করুক।

এর ফলে বিশ্বের ২৫টি বড় দেশের মধ্যে ২০২০ সালের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হারে ভারতে সবচেয়ে বেশী অবনমন হয়েছে (-২৩.৯%) বাড়ছে কর্মচ্যুতি, বেকারত্ব, ক্ষুধা।

তাহলে ভবিষতের রূপরেখা কি? রাষ্ট্রের ভূমিকা কে প্রসারিত করে জাতীয় অর্থনীতিকে পুননির্মাণ করা? চাহিদা সৃষ্টি করা? সেই অনুসারী আর্থ সামাজিক নীতি নির্ধারণ করা।

Economic & Political Weekly [Vol LV. No. 21, May 23, 2000, Page-23] এর একটি article-এ লেখা হয়েছিল—

''It is time for significant change. India is responding to the Challenge in several ways; but in the Post Covid-19 normal, by adopting ''Zero hunger'' as an explicit goal, prospects could be a lot better...

Most immediately, India needs to prepare an exit stategy from the lockdown. While economic activity should be resumed and supply chains restored and improvd, special attention should be paid to protecting income, livelihoods and food security amongst the Vulnerable groups. Removing supply bottle necks and providing demand stimulus (via incomes) could work in tandem with restoring economy.'

আমরা আশায় ছিলাম। কিন্তু বাস্তবায়নের যে পন্থা নেওয়া হচ্ছে তা হতাশাজনক শুধু নয় আশংকাজনক। উদাহরণ স্বরূপ কৃষি বিল, শ্রম আইন সংস্কার, বিলগ্নিকরণের যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তার নেতিবাচক প্রভাবের কথা ভেবে আশঙ্কা তৈরী হচ্ছে জনমানসে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষিত হতে চলেছে, একই সাথে ন্যুনতম সহায়ক মূল্য অবলুপ্ত হলে কৃষকের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এইসাথে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের সংস্কার মজুতদারি বৃদ্ধির অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করবে বাজারে তৈরী হতে পারে কৃত্রিম সঙ্কট। আবার কোভিড উত্তরকালে শুয়ে পড়া অর্থনীতির কারণে মানুষের হাতে অর্থ নেই ফলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন তৈরী হবে আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামোতে নজর দেবার বাস্তবতা তৈরী হয়েছে কোভিড পরবর্তী সময়ে। সরকার এই ক্ষেত্রগুলিতে কিছু সংস্কারও আনার চেষ্টা করছেন। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ প্রণয়ন হয়েছে—সংশ্লিষ্ট মহলের একটি বড় অংশ এরই মধ্যে প্রশ্ন তুলেছেন এই সংস্কার প্রান্তিক মানুষের উপকারে আসবে না, সার্বজনীন শিক্ষার ভাবনা বরং সঙ্কুচিত হবে। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন কেন্দ্রীভবনের প্রবণতার কারণেই এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।

প্রশ্ন আরো আছে; প্রশ্ন আছে জাতীয় অর্থনীতি নিয়েও। এরকম পরিস্থিতিতে সরকারকে জাতীয় অর্থনীতিতে চাহিদা সৃষ্টির দিকে মন দিতে হবে, অর্থাৎ কর্মসংস্থানের প্রশ্ন-এ অগ্রাধিকার কাম্য। সংগঠিত ক্ষেত্রকে আরো সংগঠিত করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের উন্নয়নে জোর দিতে হবে কিন্তু নয়া উদারনীতিতে সে সম্ভাবনা কষ্টকল্পনা। মহামারীর পরিস্থিতিতেও ঢালাও বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, জাতীয় সম্পদ বিক্রি হচ্ছে এমনকি রেলেও বেসরকারীকরণ হয়েছে। আত্মনির্ভরতার নামে ২০ লক্ষ কোটি টাকার যে স্টিমুলাস প্যাকেজের ঘোষণা হয়েছে অর্থনীতিবিদদের একাংশ তাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বুদবুদ বলে অভিহিত করেছেন এবং Trickle down theory-তে তার কতটুকু সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌছবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করিয়ে দিয়েছেন আমেরিকার ডট কম বুদবুদ বা realestate বুদবুদ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ছিল। সমালোচকদের দৃষ্টিতে এতে সুবিধা পাবে বৃহৎ পুঁজির মালিকরা যারা ঋণ হিসাবে এই অর্থ নেবেন। আবার অন্যদিকে শ্রম আইন

সংস্কারের মাধ্যমে ঐতিহাসিক লড়াই এর ফসল ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের নীতি কার্যকর করা শুরু হয়েছে। এই নতুন ভারতের স্বপ্ন, দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হবে না তো সাধারণ মানুষের মনে এই সন্দেহ ক্রমশঃ দানা বাঁধছে। ব্যাঙ্ক, বীমা, বেসরকারিকরণের ভাবনা চিন্তায় আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা তীব্র হচ্ছে।

অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিভাজনের ফাটল চওড়া হয়; প্রগতিশীল সমাজ, রাষ্ট্র ঢুকে পড়ে সঙ্কীর্ণতার আবর্তে, ধর্মের নামে হানাহানি শুরু হয়। আমরা স্বপ্ন দেখি নতুন এক ভারতের। সবার হাতে কাজ সবার পেটে ভাতের। সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিভাজন এই সময়ের দাবি নয়। এই সময়ের দাবি বিকাশের, এই সময়ের দাবি শক্তিশালী রাষ্ট্রের, এই সময়ের দাবি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের শপথকে কার্যকরী করার। আমরা স্বপ্ন দেখি সেই আত্মনির্ভর ভারতের যেখানে জামালোরা স্কুল থেকে বাড়ির রাস্তায় হাঁটবে বিনা ভয়ে, আত্মনির্ভর হওয়ার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে। আমরা ভুলতে চাই রেললাইনে রক্তমাখা রুটির দুঃস্বপ্ন।

আমরা ইতিহাস বিস্মৃত হতে চাই না। ঐতিহাসিক লড়াই-এর ফসল হারাতে চাই না। আমরা চাই কোভিড উত্তর ভারতের নয়া ইতিহাস। মানুষ কিন্তু পারে। মানুষই পারে অমাররাত্রির দুর্গতোরণ ভেঙ্গে আলোর পথে এগোতে।

"ও আলোর পথযাত্রী এ যে রাত্রি এখানে থেমো না
এ বালুর চরে আশার তরণি যেন বেঁধো না।" ❐

অতিমারী—বিশ্ব শ্রমজীবীদের কণ্ঠস্বর

দেবব্রত ঘোষ

শিরোনাম যাইই হোক, বিষয়টা আসলে সেই খিদের সাতকাহন। হ্যাঁ, নতুনত্ব কিছু নেই, কারণ ১৭৬৫-র ওয়াটসনের স্টিম ইঞ্জিন, ১৭৬৯-র আর্করাইটের জলশক্তিচালিত চাকা এবং ১৭৮৫-র কার্টরাইটের যন্ত্রচালিত তাঁত আবিষ্কারের পর থেকেই মানবিক মুখ সম্বলিত বিশ্ব সাহিত্যের এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দখল করে বসে বসে আছে 'খিদের কথা'। যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার ২৫৭ বছর পর এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরও বিষয়টি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বরং বলা যায় তা' ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, সাথে সাথে গবেষণাও পৌঁছেছে আরও গভীরে। জীব বৈচিত্রের ধ্বংস, জঙ্গল সাফ, জলবায়ুর কৃত্রিম পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং অপরদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বাজনিত নিত্যনতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন যাকে কিনা ক্রমবর্ধমান মনুষ্য প্রজাতির প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করার অজুহাতের আড়ালে জল-জঙ্গল-প্রকৃতি-প্রযুক্তির উপর অধিক মুনাফার স্বার্থে পুঁজির দখলদারিত্বে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল, ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। মাঝখানে এসে পড়েছে 'অতিমারী' ফলে সঙ্কট এখন গভীরতর। বিশ্ববাজারের কানাগলিতে যে শব্দ শোনা যায় সেই শব্দ এখন প্রকাশ্যে রাষ্ট্রনায়কদের গলায়। অনেকদিন বাদে পুঁজিপতিদের আভ্যন্তরীন ঘৃণ্য প্রতিযোগিতার বিপরীতে 'অতিমারী'কে এক সর্বজনগ্রাহ্য অজুহাত হিসাবে দাঁড় করানোর তীব্র প্রচেষ্টা। ভাবখানা এমন যেন সবাই বেশ ছিল দুধেভাতে, আচম্বিতে একটা ভাইরাস এসে সুখের ছন্দটাকে এলোমেলো করে দিল। আপত্তিটা তো এখানেই—বৃহৎ অংশের মানুষের মানবিক সত্ত্বাও আজ কখনওকখনও পরোক্ষ সায় দিয়ে ফেলছে এই অজুহাতের পক্ষে। কিন্তু, সত্যিই কী সে এলো নীরবে, অজান্তে?

নভেম্বর ২০০২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯। পাঁচটা মহামারী অথবা অতিমারী। SARS (২০০২-২০০৩); SWINE FLU (২০০৯-২০১০); গত শতকের AIDS ও ছিল পশুবাহিত রোগের মহামারী। কোভিড-১৯ ল্যাবরেটরীতে লিক করা নাকি প্রকৃত ইচ্ছা করে ছড়িয়ে দেওয়া এ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অসম বিতর্ক আজও বর্তমান কিন্তু একথা অস্বীকার করা কোন উপায় নেই যে এই রোগটির উৎসও আসলে সেই zoonotic। WHO-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এযাবৎ 'স্বীকৃত' সমস্ত সংক্রামক রোগের ৬০% এবং 'উদীয়মান' সংক্রামক রোগগুলোর ৭৫% এর উদ্ভব কোনও না কোনও প্রাণী থেকে। ১৯৭০-এর দশক থেকে নতুন রোগের সংখ্যা বেড়ে চারগুণ হয়েছে যেগুলোর মধ্যে অন্ততঃ ৪০টা রোগ এক প্রজন্ম আগেও জানা ছিল না। প্রশ্ন ২০১৯ এও কী জানা ছিল না? বিজ্ঞানীরা কী তাদের দায়িত্ব পালন করেন নি? রাষ্ট্রনায়করা আজ যেভাবে টীকা আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় বিচলিত বোধ করছেন, এ বোধ কী সত্যিই বিবেকসংশ্লিষ্ট নাকি নাটকীয়তার মোড়কে সত্যের অপলাপ?

''...The single biggest threat to man's continued dominance on this planet is the VIRUS...'' এই গ্রহে মানুষের ধারাবাহিক আধিপত্যের সামনে একক বৃহত্তম বিপদ হলো ভাইরাস। আজ নয়, উক্তিটি করেছিলেন মোবেল ল্যারিয়েট নামে এক বিজ্ঞানী। করেছিলেন ১৯৫৮ সালে। ১৯ই মে ২০০৭ Europen Molecular Biooogy Organization (EMBO) থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্ট। শিরোনাম:— Inevitable of avoidable? Despite the Lessons of History, the world is not yet ready to face the next Plauge''— অনিবার্য

নাকি এড়ানো সম্ভব? ইতিহাসের শিক্ষা সত্ত্বেও পরবর্তী মহা প্লেগের মোকাবিলায় পৃথিবী এখন প্রস্তুত নয়। 'পরবর্তী মহাপ্লেগ' শব্দবন্ধ এখানে—রূপক, বিউবোনিক প্লেগ নয়, আজকের মতো অতিমারীকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই রিপোর্টেই Imperial College-এর এক মহামারী বিশেষজ্ঞ (Epidemiologist) এবং গবেষক William Hange জানিয়েছিলেন "...We can be pretty certain that the probability of another flu pandemic is 100%, though we cannot say when exactly...'। ফলে সম্ভাবনা নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না এবং সেই অতিমারীকে মোকাবিলা করার মতো স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো বিশ্বের বেশীরভাগ রাষ্ট্রেরই যে নেই সেকথাও বিজ্ঞানীরা ২০০৭ সালেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে অজানা অচেনা একটা ভাইরাস গোটা বিশ্ব অর্থনীতিকে তছনছ করে দিয়ে গেল—রাষ্ট্রনায়কদের এই অভিব্যক্তি ও বিশ্লেষণ আসলে নিজেদেরকে আড়াল করার অপচেষ্টা এনিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না, থাকতে পারে না। থালা বাজিয়ে, বাতি জ্বালিয়ে অথবা দরজা জানালা খুলে দিয়ে ভাইরাস তাড়নোর নিদান দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানের দৈন্য থাকতে পারে, থাকতে পারে নাটকের আড়ালে সত্যকে সামনে না আনার তাগিদ, থাকতে পারে পুঁজির নায়ক আর রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে সমঝোতার স্বকীয় গাম্ভীর্য এবং চতুর পলিটিক্যাল এজেন্ডা কিন্তু শ্রমজীবী মানুষকে আজ সোচ্চারে বলতেই হবে "হে বিজ্ঞজনেরা, আমি আজ সহজ করে বুঝতে পেরেছি কেন এই অতিমারী সময়ে অতিমারী-বিশেষজ্ঞ এবং ভাইরোলজিস্টদের পেছনে রেখে তোমরা বারবার আমাকে আমার ভবিষ্যতের গল্প শোনাতে টিভির পর্দায় হাজির হচ্ছো? আমার সর্বনাশের মধ্য দিয়ে আমার দ্বারা নির্বাচিত হয়ে, আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি আসলে কাদের সেবায় ব্যস্ত, একটা ভাইরাস আমাকে কানে কানে সেকথা বলে দিয়ে গেছে।' এবারে খুব সঙ্গতভাবেই একটি প্রশ্ন তোলা যায় যে, সত্যিই কি বিজ্ঞানীদের রাতজাগা পরিশ্রমের দলিলগুলো বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে? আর যদি তাই হয়, তাহলে কেন? ভাইরাস'তো ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে আক্রমণ করছে না, রুটি-রুজি হারানোর ভয় সব মানুষের না থাকলেও মৃত্যুর বিভীষিকা এবং ভয় সব মানুষের ক্ষেত্রেই তো একই রকম? এখানেই লুকিয়ে আছে আসল সমীকরণ। প্রথমে উত্তর দিই, পরে আসা যাবে সমীকরণ প্রসঙ্গে। উত্তরটা হলো হ্যাঁ, চেষ্টা হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন নামে বহু প্রজেক্ট এককভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে এবং কখনও একাধিক দেশের সম্মিলিত প্রয়াসেও শুরু হয়েছিল। হয়েছিল সতেরো বছর আগে থেকেই কিন্তু মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল অসংখ্য প্রজেক্ট। শব্দসংখ্যার সীমাবদ্ধতার কারণে একটা 'প্রজেক্ট' অন্তত উদাহরণস্বরূপ হাজির করি। ধরা যাক, 'PREDICT'। ২০০৯ সালে US Agency For International Development (USAID)-এর তরফ থেকে 'PREDICT' প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়। নাম থেকেই স্পষ্ট যে প্রজেক্টটির লক্ষ্য ছিল মহামারীর বিপদগুলো সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী (Predict) করতে পারা। ফোকাস পয়েন্ট ছিল 'প্যানডেমিক ঘটানোর সম্ভাবনাসম্পন্ন ভাইরাসগুলোকে চিহ্নিত ও আবিষ্কার করার জন্য বিশ্ব-সামর্থকে শক্তিশালী করা, সাথে সাথে মানুষের মধ্যে বড়মাপের প্যানডেমিক তৈরী হওয়ার আগেই প্যানডেমিক তৈরী করার সম্ভাবনা সম্পন্ন প্যাথোজেনগুলোকে তাদের উৎসের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলা। "The goal is to move countries away from a reactive post outbreak response to a proactive approach in which pathogens of pandemic potentials are discarded at their source before large scale epidemics occur in people.'। পরিষ্কার যে, পশুবাহিত রোগের উৎসগুলোর জায়গা চিহ্নিত করে সেখানে পুরো বিষয়টিকে আটকে রেখে গবেষণা চালানো। দশ বছর প্রজেক্টটা চলেছিল। ৬০ খানা বিদেশী ল্যাবরেটরী এই প্রজেক্টে যুক্ত ছিল। Wuhan Institute of Virology তাদের অন্যতম। প্রজেক্টটা চলেছিল দুটো পঞ্চবার্ষিকীর আর্থিক বরাদ্দ মারফৎ। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় পর্বের কাজও সম্পন্ন হয়েছিল। হঠাৎ সেপ্টেম্বরে প্রজেক্টটির

ফান্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়। চূড়ান্ত এবং তৃতীয় ধাপ শুরুর আগেই প্রজেক্টটি বন্ধ হয় এবং তার তিনমাস বাদে ডিসেম্বরে আমরা কোভিড-১৯ শব্দটি প্রথম শুনতে পাই। তাৎপর্যপূর্ণ হলো এটাই যে চিনে প্রাদুর্ভাবটার গোড়াতেও মার্কিন প্রশাসন নোটিফাই করে জানিয়েছিল "তবুও Project PREDICT বন্ধই থাকবে"। ২০২০ Los Angeles Times পত্রিকার একটি প্রতিবেদন থেকে উঠে এল তথ্য। PREDICT প্রজেক্টটির দ্বিতীয় ধাপ সম্পন্ন হবার পর প্রাপ্ত ফলাফল। ১০,০০০-এর বেশী বাদুড় ২০০০ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে তখনও পর্যন্ত ১ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশী নমুনা (Biological Sample) সংগ্রহ করা হয়েছিল। আবিষ্কৃত হয়েছিল ১২০০ ভাইরাস যাদের মধ্যে সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে মানুষের শরীরে প্রবেশ করার ভিতর দিয়ে প্যানডেমিক ঘটানোর। ১২০০-র ১৬০-এর মতো পাওয়া গিয়েছিল 'করোনা ভাইরাস'। এশিয়া, আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর ৩০টা দেশের চিকিৎসা ও কৃষিক্ষেত্রে প্রায় ৭০০০ মানুষকে প্রজেক্টের কাজে ট্রেনিং দেওয়া হছিল। প্রজেক্টটির নেতৃত্বে (Principal Investigator) ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের UC Davis School of Veterinary Medicine-এর One Health Institute-র Professor, Jonna Mazet। Mazet নিজেও পরবর্তীতে জানিয়েছেন যে চিনের Wuhan Institute of Virology ও এই প্রজেক্টে যুক্ত ছিল এবং সেখানকার বিজ্ঞানীরা COVID-19 রোগ সৃষ্টিকারী নয়া করোনা ভাইরাসটিকে (SARS-COV–2) খুব দ্রুত চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আরো একটা তথ্য যোগ করলে আমরা দ্রুত PREDICT প্রজেক্টটির কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। PREDICT প্রজেক্টটির অন্যতম পার্টনার ছিল Eco Health alliancel হয়তো সমীকরণের আভাষটা মিলতে শুরু করলো এতক্ষণে। উল্লেখ্য যে Eco health এর প্রেসিডেন্ট Peter Daszak প্রচণ্ড আক্ষেপ করে জানিয়েছেন যে প্রজেক্টটা বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে মহামারী সৃষ্টি করার ক্ষমতাসম্পন্ন বিপজ্জনক ভাইরাসগুলোকে আগে থেকেই চিনে নেওয়ার কাজটাই থেমে যাওয়া এবং মানুষকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া। ক্ষোভের সাথে তিনি বলেছেন, "...It is common sense to know your enemy. Instead, we are all hiding inside our houses, as we wait around for a vaccine–that's not a global strategy to battle a dangerous virus...'। ফান্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষোভে মার্কিন কংগ্রেসের এক নির্দল সেনেটর Arugs King ২১শে নভেম্বর ২০১৯-এ USAID-কে লেখা একটি পত্রে উল্লেখ করেন 'আন্তর্জাতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে পশুবাহিত রোগের প্রসার ও আবির্ভাব ঘটার বিপদও ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং HIV, Ebola-র প্রসারের পেছনেও চালকের ভূমিকায় থেকেছে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা ও বিশ্ববাণিজ্য...'। উত্তরে USAID জানায় '...তারপরও ফাণ্ডিং বন্ধ রাখাহচ্ছে এবং প্রজেক্টটিকে যে পুনরায় রিনিউ করা হবে না—সেরকমই সিদ্ধান্ত হয়েছে..'। আশ্চর্য্য সমাপতন; ঠিক যেদিন চীন প্রশাসন WHO-কে জানায় যে একটা 'অজানা নিউমোনিয়া'র খবর ও অস্তিত্ব মিলেছে ঠিক সেদিনই অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখেই USAID উত্তরটি লেখে সেই নির্দল সেনেটরকে। বাকিটা ঘটমান বর্তমান।

এবার উত্তর খোঁজার পালা। এত অর্থ বিনিয়োগ করে একদম শেষ পর্বে কেন প্রজেক্টটিকে বন্ধ করে দেওয়া হলো? ভাইরাসজনিত সংক্রমণ এবং মৃত্যুভয় ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে একই, তাহলে বৃহৎ পুঁজির মালিকরাও নিজেরে মৃত্যুর ঝুঁকিটা নির্দ্বিধায় মেনে নিল কেন? হ্যাঁ এর কারণ এখনও পর্যন্ত কোন জার্নালে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু এর উত্তর খুবই সহজ এবং সরল। ইতিহাস আর অভিজ্ঞতা থেকে এর উত্তর খুঁজে নেওয়া যায়। আর এই উত্তর খোঁজাটাই আজকের সচেতন সমাজের দাবি, প্রয়োজনীয় কর্তব্য। তিনটি প্রশ্ন-উত্তর এখানে প্রাসঙ্গিক। কখন প্রজেক্টটিকে বন্ধ করা হলো? ঠিক যখন তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ের গবেষণা শুরু করা হবে,যখন ১৬০টি প্রজাতির করোনা ভাইরাস আবিষ্কৃত এবং তাদের ধ্বংসাত্মক মাত্রাটিও নিরূপিত। তৃতীয় পর্যায়ে কী কাজ বাকি ছিল?

ভাইরাসকে রুখে দেবার নিদেনপক্ষে একটা প্যানডেমিক রুখে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টিজেন খুঁজে বার করা যা মানবশরীরে অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করে তৈরি হয় অ্যান্টিবডি নতুবা অনুকূল সহাবস্থানের একটা ব্যবস্থা করা। প্রজেক্টটির সহযোগী পার্টনার কে ছিল? Eco Health Alliance। গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিলএবং পুনর্বার অর্থ বিনিয়োগ করতে হতো এবং ফলস্বরূপ মনুষ্য প্রজাতিকে কম ক্ষতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে রক্ষা করার জন্য কাঙ্ক্ষিত অ্যান্টিজেন খুঁজে পাবার সম্ভাবনা ছিল। সমস্ত রাষ্ট্রকে জনকল্যাণমুখী আপাতঃ উন্নত পরিকাঠামোসম্পন্ন মানব-বান্ধব স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটা SOP বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল। ফের বিনিয়োগ। হয়তো একটা অতিমারীকে রুখে দেওয়া যেত। কিন্তু এই যে তিনটে পর্যায়ে এত অর্থ বিনিয়োগ করা হতো তার আউটপুট কী পাওয়া যেত? লাভ-লোকসানের নিরিখে নিঃসন্দেহে তা শূন্য। সভ্যতাকে বাঁচানোর চাইতে তখন বড় তাগিদ বিনিয়োগকৃত অর্থ অধিক মুনাফা সহ ফেরৎ আনা। আক্রান্তের সংখ্যা না বাড়লে, প্রথমত ভ্যাকসিন-গল্প এবং সেই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রটি খুব বিস্তৃত হতে পারতো না। এবং দ্বিতীয়তঃ গুটি কয়েক দেশ বাদে সারা বিশ্বব্যাপী যে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ফাঁদ পেতে রাখা আছে, বর্তমান সময়ে তাদের এই লুঠের লাইসেন্সটুকুও পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো না। অন্য সহযোগী বন্ধুরা, শিল্প-প্রযুক্তি পুঁজির কারবারীদের কাছেও সমান্তরালভাবে এক সুযোগ নতুনভাবে উন্মোচিত হলো। কর্মী সঙ্কোচন, বেতন হ্রাস, দৈনিক কাজের সময় বাড়ানো যা চলছিল আবার শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষিপ্ত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে যে বাধার মুখে তাদের পড়তে হচ্ছিল তা দূরীকরণের ব্যবস্থা মসৃণভাবে কার্যকরী করার পথ বিস্তৃত হলো অতিমারীর সুযোগে। আর এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই অধিকাংশ রাষ্ট্রশক্তি থাকছে অনুঘটকের ভূমিকায়—একদম পূর্ব নির্ধারিত Strategic Adjustment Programe। জানা হয়ে গেছে যে বর্তমান ভাইরাসটির আক্রমণ করার ক্ষমতার নিরিখে মারণ ক্ষমতা যথেষ্ট কম। সামর্থ অনুযায়ী সর্বোচ্চ একটি ভেন্টিলেটরই যথেষ্ট। ফলে, যে সামান্যতম মারণ ক্ষমতা আছে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তার বলি হবে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ। সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামোগত অপ্রতুলতার শিকার যদি কেউ হয় তবে সে বা তাঁরা অবশ্যই সমাজে সেই প্রান্তিক অংশটুকুই। এ শিক্ষা ইতিহাসের। চলমান লগ্নিপুঁজিবাদী অর্থনীতির পৃষ্ঠেপোষকরা রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে বিজ্ঞান-গবেষণা-প্রযুক্তির শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই মদত দেন যেখান থেকে শুধুমাত্র তাদের মুনাফা হয় সর্বোচ্চ। অতিমারীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার নয়, হয়ওনি। গৃধ্নুতার একটা সমীকরণ। পারফেক্ট সমীকরণ।

২০০৮-এর পর পুঁজিবাদ নিজের সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য আবারও একটা স্পর্শকাতর, কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ভয়ের আবহকে সাধারণ মানুষের কাছে ঢাল হিসাবে দাঁড় করিয়ে মুনাফা লুঠতে চাইছে। নিজেদের 'আভ্যন্তরীণ সঙ্কট' এবং নিজেদের মধ্যে ঘৃণ্য প্রতিযোগিতাকে আড়াল করতে পুঁজির কারবারিরা এতোদিন শুধু নিজেরাই কানাগলিতে ঘুরপাক খাচ্ছিল কিন্তু এই অতিমারীর সুযোগে তারা নিরন্ন-অল্প সাক্ষর-শ্রমজীবী মানুষকে সত্যের অপলাপের দ্বারা একেবারে সেই কানাগলিতেই নিয়ে এসে দাঁড় করাতে মরিয়া। আর তাদের তল্পিবাহকরা 'ভগবানের মার', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' যে বিশেষণেই এই অবস্থাকে অভিহিত করুন না কেন একটা বড় অংশের মানুষ তা বিনা বিতর্কে মেনে নিতে বিশ্বাসী, 'বিশ্বাসে মিলায়...', ভবিতব্যের বাইরে বেরোতে তাদের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অনীহা। আমাদের নিজেদের সম্পদের একটা অংশ চাল-ডাল-গম রূপে জমা হচ্ছে রেশনে, ফিরে আসছে ভিক্ষান্ন হয়ে। তবু আমাদের গর্ব! কে ভালো? যে ডাল দিলো না কি যে চিনি দিলো! আর এই আলোচনার নিরিখেই কিনা আমার পরবর্তী নির্বাচনে স্ব স্ব মতের পক্ষে পুনর্বার প্রতিনিধি নির্বাচন করব। করোনা আক্রান্ত প্রতিবেশীর থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে গিয়ে আমরা প্রতিবেশীকেই বানিয়ে ফেলছি প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন

টোটোগাড়ির চালক তার অদৃষ্টের জন্য দায়ী করছেন নিজের বন্ধু পরিযায়ী শ্রমিককে। কার সাথে লড়াই ভালোভাবে জানা নেই, কিভাবে লড়াই হবে সেটাও অল্প জানা কিন্তু আজ প্রত্যেক আমরা ওয়ারিয়র। নিজ রাজ্যে ফিরতে গিয়ে ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, নিরন্ন মা মৃত্যুর মুখে এলিয়ে গেছে, সন্তান সেই মৃত মায়ের স্তন খুঁজে বেড়াচ্ছে—এছবি আজ আমাদের আর নাড়া দেয় না বা নাড়া দিলেও মন নিজেই তার বিরুদ্ধে 'ভগবানের মার' বা 'ভবিতব্য' গোছের অজুহাত বা সান্ত্বনা হাজির হয়ে যায়। ধর্মের কারবারীরাও বসে নেই—যাদের মুখে মাস্ক নেই তারা এক বিশেষ ধর্মের মানুষ, একথার অর্থ আজ একটিও শিশুও বোঝে. সুনিপুণভাবে একটা বৃত্ত আঁকার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।

অথচ অপরদিকে খিদে যে তীব্র জায়গায় পৌঁছেছে তাতে শুধু খালি হাতে আঙুল চোষাও আজ ব্যঞ্জনাময়—চোষার আগে হাতে স্যানিটাইজার লাগিয়ে নেওয়ার নিদান রয়েছে। আজকে মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস, পকেটে স্যানিটাইজার নিয়ে আমার প্রত্যেকে পৌঁছে গেছি 'নিউ নর্ম্যাল' যুগে, নিজের অজান্তেই। এই শব্দবন্ধটি নতুন লাগলেও আমাদের অর্থনীতি চর্চায় এর আগমন ২০০৮ সালের আগে থেকেই। সেই সময় থেকেই বেশ কিছু গবেষককে দিয়ে বলানো হচ্ছিল যে—এত মানুষের, এত শ্রমিকের কী প্রয়োজন। এটা উদ্বৃত্ত। দরকার ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড—ছায়ার বাস্তব, সেখানেই মিলবে সব সমস্যার সমাধান। আজ এই মতই পেয়েছে পালে হাওয়া। এত অফিস-কাছারী, সিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এত গা ঘেঁষাঘেঁষি, এত কাছাকাছি, এত সঙ্ঘবদ্ধতা—এসবই আজ ভয়ঙ্কর রকম অপ্রয়োজনীয়। তাই ৫ বছরের শিক্ষার্থীর মতো ৮০ বছরের অসুস্থ মানুষকেও অভ্যস্ত করানো হচ্ছে দূরভাষ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় যথাক্রমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নেওয়ার জন্য। এই দুই পরিষেবাক্ষেত্র থেকে সরকার হাত গুটিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। এটাই আজকের নিউ নর্ম্যাল আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা। ভেবে দেখার বিষয় যে উদ্বেগে আর আবেগ নিয়েই আমাদের জীবন, এর একটাকে জোর করে বাড়িয়ে দিলে জীবন আর স্বাভাবিক থাকেনা, নিউ হলেও না। ধুরন্ধরভাবে উদ্বেগ তৈরীর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের ওপর এ এক নতুন আক্রমণ কৌশল। জন্তু-জানোয়ারের মতো মানুষ শুধুমাত্র খাদ্য অন্বেষণের জন্যই সমবেত হয়না, সেই কাজে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার সাধারণ কারণ ও তার সমাধানের সাধারণ পথ (common cause & common path) খোঁজার তাগিদ থেকেও সমবেত হয়। উদ্বেগ আর আবেগের ভারসাম্যের মধ্যেই মানবজাতির এগিয়ে চলা। এই অনন্ত গতিময়তায় হোমো স্যাপিয়েন্স একসময় কাঁচা মাংস খেলেও আজ রান্না করে খায় যা বাঘ পারেনি। কিন্তু গতিময়তা বা পরিবর্তনশীলতা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নানা উপাদান (Factor)-এর ওপর নির্ভরশীল, জোর করে কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া নয়। জোর করে বা কৃত্রিমভাবে সমাজের কোনো একটা শ্রেণীকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে সমাজের ওপর গতিময়তা বা পরিবর্তনশীলতা চাপিয়ে দিয়ে আর একটি শ্রেণীর বিত্তসম্পদ বৃদ্ধি করা একটা কৌশল বা Strategy। সমাজের অগ্রবর্তী সচেতন অংশ যারা এই গতিময়তা বা পরিবর্তনশীলতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে ইতিবাচক হিসাবে দেখেন তাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এই পরিবর্তন কতটা প্রয়োজনীয়, কতটা সমাজের পক্ষে বহনযোগ্য।

কোভিড-১৯ আজ আমাদের সামনে যে সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছে তা যে জনস্বাস্থ্যের সমস্যা তা নিয়ে বিতর্ক নেই কিন্তু জনস্বাস্থ্য শুধুমাত্র কিছু হাসপাতাল বা শুকনো কিছু নথিপত্র নয়—দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং কাণ্ডজ্ঞান এই চার স্তম্ভের ওপরই তার অবস্থান। কাণ্ডজ্ঞান হলো বিজ্ঞানেরই আর এক রূপ। মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর অজুহাতে নির্বিচারে জল-জঙ্গল-খনিজসম্পদ ধ্বংস করা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় নয়, দরকার মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা লোটার প্রতিযোগিতার লাগাম ধরে রেখে সঠিক কৌশল প্রয়োগের রাজনৈতিক সদিচ্ছা। অতিমারীর প্রেক্ষাপটে লকডাউন শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ছড়াতে শুরু করলো সুনীল

আকাশ, প্যারিসের পথে রাজহাঁসের সারি, ভেনিসের জলে ডলফিনের ডিগবাজি। আর আমরাও যেন বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে প্রকৃতি নিজেই তাহলে সেরে ওঠার উদ্যোগ নিয়েছে, মেনেও নিতে চাইলাম যে প্রকৃতির এই স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধারে দু'এক লাখ লোকের মৃত্যু যেন 'কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ'। ডাহা মিথ্যা। সোস্যাল মিডিয়ার ঐ যে ছবিগুলো দেখেছেন সেগুলো পুরোনো ক্লিপিংস, National Oceanic & Atmospheric Administration এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই লকডাউন পর্বেও এপ্রিল-২০২০-তেও বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ঘনত্বের পরিমাণ রেকর্ড ছাপিয়ে পৌঁছেছিল ৪১৬.১৭ পিপিএম। বোঝানোর চেষ্টা ছিল যে আসল ভাইরাস হলো অগণিত খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ।

কর্পোরেট লগ্নিপুঁজি আর তার দালাল রাষ্ট্রশক্তি, দালাল মিডিয়ার সম্মিলিত আক্রমণ এবং কৌশলে গোটা বিশ্ব জুড়ে শ্রমজীবী মানুষের দমবন্ধকর পরিবেশ। শ্রমিক ছাঁটাই, লে অফ, কম মজুরী, কাজের সময় বৃদ্ধি পুঁজির নিয়মে এ সবই চলছিল মাঝখান থেকে একটা মহামারীকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করিয়ে কাঙ্ক্ষিত সংস্কারগুলো, এ্যাজেন্ডাগুলো দ্রুত কার্যকর করে নেবার মরিয়া উদ্যোগ চলছে দুর্বার গতিতে, রেহাই পাচ্ছেনা ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ, ক্ষুদ্র ব্যবসাদার, কৃষি মজুর, হকার। Oxfam International জানাচ্ছে যে নতুন করে বেকার হয়ে যাওয়ার দরুন সারা পৃথিবীতে অনাহারে দৈনিক মৃত্যু দাঁড়াতে চলেছে ১২০০০। অথচ এই পরিস্থিতির মধ্যেও চলছে উগ্র দক্ষিণপন্থার আস্ফালন। আমেরিকা সহ ফ্রান্স, সুইডেন, ইতালি, ইউক্রেন, জার্মানীতে নব্য-নাৎসীপন্থীরা দাবী তুলছে জাতীয় অভ্যুত্থানের, দাবী তুলছে বিদেশীদের জন্য সীমান্ত সিল করে দেওয়ার—উদ্দেশ্য এশিয়া থেকে আগত শ্রমিক, উদ্বাস্তু, অভিবাসীদের প্রতিরোধ করা। দেশে দেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্ত বিক্ষোভের জন্য দায়ী করা হচ্ছে কোভিড-১৯ কে আর এই অজুহাতে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে মুক্ত সীমানা চুক্তি—'শেনজেন' বাতিলের দাবি উঠেছে। পঞ্চাশটিরও বেশী দেশে সংসদকে গুরুত্বহীন করে অনির্দিষ্টকালের জন্য জরুরী অবস্থা জারির দ্বারা শাসক ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। করোনো ভাইরাস একটা অস্ত্র আজ। একটা সুযোগ। আজারবাইজান, ফিলিপিন্স, তাইল্যান্ড, তুরস্ক, পোল্যান্ড—প্রভৃতি রাষ্ট্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অবস্থা এতটাই গুরুতর যে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবকেও আসরে নামতে হয়েছে। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে—করোনা ভাইরাসমহামারী পরিণত হচ্ছে বিরাট এক মানবাধিকার সঙ্কটে। তিনি সতর্কবাণী শুনিয়েছেন যে ব্যক্তির মানবাধিকার গুঁড়িয়ে দিতে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহের গতিরোধ করার জন্য কোনো রাষ্ট্র যেন একে (মহামারীকে) অজুহাত হিসেবে ব্যবহার না করে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আপৎকালীন ব্যবস্থা দিয়ে যা শুরু হয়েছিল তা এখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধে উদ্যত।

এবার একটু দম নেবার পালা। দুটো মৌলিক প্রশ্ন—১, স্পেন, জার্মানী, হাঙ্গেরী নিয়ে ভেবে আমাদের কী লাভ? ২, করণীয়ই বা কী আছে আমাদের? প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আমি খুব সহজেই দিতে পারি কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের সরাসরি সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর দেবার যোগ্যতা এবং পাণ্ডিত্য বা ধীশক্তি আমার নেই। সচেতন সহকর্মী, বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই উঠে আসুক এর উত্তর। এই উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমার এবং আমার আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত। তবুও নৈতিকভাবে এই প্রবন্ধ হঠাৎ এখানে থামিয়ে দিয়ে দায় মিটিয়ে ফেলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। বরং শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে এটাও আমার দায় এবং অধিকার যে দ্বিতীয় প্রশ্নটির সরাসরি সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর দিতে না পারলেও প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে উত্তরটা দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ এবং অভিমুখটার অবতারণা এখানে করে রাখার। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এখানে বলি যে স্পেন, জার্মানীর প্রসঙ্গ এখানে আনা হয়েছে একটা 'সাপেক্ষ' হিসাবে যাতে রাষ্ট্রনায়কের শ্রেণী চরিত্রটা খুঁজে নেওয়া সহজ হয়।

অতিমারী শুরুর ঠিক আগে Global Hunger Index-এ আমাদের দেশের স্থান ছিল ১০২। অথচ গত বাজেটে জিডিপি অনুপাতে খাদ্যে ভর্তুকি হ্রাস, MGNREGA প্রকল্পে বরাদ্দ হ্রাস, রাসায়নিক সারে ভর্তুকি ছাটাই সহ জনস্বার্থবাহী সমস্ত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে হ্রাস করার পাশাপাশি বৃহৎ পুঁজির মালিক ও কর্পোরেট হাউসগুলোকে দেওয়াহয়েছে বহুবিধ আর্থিক ছাড়। এরসাথে তো আছেই সরকারী কোষাগার লুঠ করার নানাবিধ ফন্দি, বৃহৎ কর খেলাপী, ঋণ, খেলাপীদের পৃষ্ঠপোষণ। আর তাই Oxfam India-র Report বলছে ভারতের ধনীতম ১% এর সম্পদের পরিমাণ দরিদ্রতম মানুষের ৭০% এর চারগুণ। অতিমারীজনিত পরিস্থিতিতে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারী অপরিকল্পিত লকডাউনের সিদ্ধান্ত কয়েক কোটি শ্রমিক পরিবারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। দেশের অর্থমন্ত্রী ২১ লক্ষ কোটি টাকার স্টিম্যুলাস প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন যা বাস্তবে তথ্য আর তত্ত্বের জাগলারী ছাড়া কিছুই নয়। দেশের ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ৮০ কোটি মানুষ প্রান্তিক অবস্থানে পৌঁছে যাবার প্রহর গুনছে। এর বিপরীতে আমাদের রাষ্ট্রনায়কের গলায় 'আত্মনির্ভর' ভারতের স্লোগান। 'আত্মনির্ভর' ভারত গড়ার প্রথম তিনটে কর্মসূচী হলো—সরকারী সম্পত্তি বৃহৎ পুঁজিপতির কাছে বেচে দেওয়া, কৃষি ব্যবস্থাকে কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দিয়ে সরকারের হাত গুটিয়ে নেওয়া আর তৃতীয়ত শিল্পশ্রমিকদের অর্জিত নূন্যতম আইনী রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করা; অজুহাতটা কোভিড-১৯ হলেও রাজনৈতিক এ্যাজেন্ডাটা পুরোনো। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা আইনকে ঢাল করে সেই অ্যাজেন্ডার বকেয়া কাজ চলছে জোর কদমে। এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের অভিমুখ তৈরীর প্রচেষ্টা।

এক, সিয়েটল থেকে জেনোয়া। জনগণ বনাম রাষ্ট্রশক্তি। সমাজবাদ বনাম নয়া উদারবাদ।উগ্র দক্ষিণপন্থার আস্ফালনের বিরুদ্ধে বিশ্বায়িত প্রতিবাদ। The Economist-এর মতো পত্রিকার পরামর্শঃ মার্কসকে পড়ুন, বিশ্বের শাসকরা কার্ল মার্কস পড়ুন। The New York Times তার উত্তর-সম্পাদকীয়তে লিখছে—'শুভ জন্মদিন কার্ল মার্কস। আপনি ছিলেন সঠিক।' এই সহস্রাব্দের তরুণদের অধিকাংশই প্রত্যাখ্যান করেছে পুঁজিবাদকে—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই তথ্য। ব্রিটেন, মার্কিন মুলুক, ফ্রান্স থেকে লাতিন আমেরিকা, মধ্য প্রাচ্য, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া—বিক্ষোভ সর্বত্র। বেপরোয়া প্রতিরোধ। বাজারের বোঝাপড়ার নিয়মের বাইরে মানুষ নিজের ভবিষ্যত বুঝে নিতে চাইছে। অধ্যাপক শোয়ার্টজের উদ্ধৃতি থেকে বলতে হয় যে এই মহামারী আসলে আজকের বাজারসর্বস্ব পুঁজিবাদের রঙীন নির্মোক খসিয়ে ভেতরের অস্থিসার কদর্য চেহারাটাকে উলঙ্গ করে দিয়েছে।

দুই, চিন—বহু রটনা আছে। প্রজাতান্ত্রিকদেশের বেসরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে টিপ্পনী আছে। কিন্তু শৃঙ্খলাপরায়নতায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রাধান্য এখনও তাদের সর্বাধিক। আর তাই লকডাউনের ৭৬ দিনের মাথায় জনজীবনকে স্বাভাবিক ছন্দে নিয়ে আসতে পেরেছে।

ভিয়েতনাম—মহামারী মোকাবিলায় চমকে দিয়েছে বিশ্বকে। মৃত্যু শূন্য। সাফল্যের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা থাকলেও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় রয়েছে রাষ্ট্রের আধিপত্য।

কিউবা: সমুদ্র আটকে থাকা ব্রিটিশ জাহাজে সংক্রমণ। কোনো দেশই তাদের বন্দরে ভিড়তে দিচ্ছে না। কিউবা সেই জাহাজকে নিয়ে আসে হাভানা বন্দরে, সংক্রমিতদের হাসপাতলে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করায়। এই অতিমারীকালে বিশ্বের ৩৭টি দেশে পৌঁছেছেন কিউবান স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসকরা. এই ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্রটিতে মাথাপিছু চিকিৎসকের সংখ্যা বিশ্বে সর্বোচ্চ।

তিন, গোষ্ঠী ক্লাষ্টার, কমিউনিটি কিচেন—এই শব্দগুলো সেই পুরোনো সোভিয়েত ইউনিয়নের স্মৃতি ফিরিয়ে

আনে। সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদী উপকরণগুলোই আজ অতিমারীর মোকাবিলায় সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তম ও কার্যকরী হাতিয়ার। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বীকার করুক আর নাই করুক খেটে খাওয়া মানুষের উপলব্ধিতে তা ভাস্বর।

সামগ্রিক এই ছবির বিচারেই আমাদের নির্ধারণ করতে হবে কর্মসূচী। আমরা কি বিকল্প পন্থা চাই? যদি না চাই তবে ভিন্ন কথা, কিন্তু যদি চাই তবে কেমন হওয়া উচিৎ সেই ব্যবস্থা? ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে সারা পৃথিবীর সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সমাজতান্ত্রিক এক বিশ্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টায় রাস্তায় নেমে পড়েছে। তবে, ক্ষোভের সাধারণ (Common) কারণটাকে তারা উপলব্ধিতে এনেছেন। বর্তমান ব্যবস্থাটার প্রতি তারা আস্থা হারিয়েছেন। বিকল্প সমাজব্যবস্থা, বিকল্প অর্থনীতির সন্ধান চাইছেন। তার মানে এই নয় যে সকলে সমাজতন্ত্রকেই একমাত্র বিকল্প বলে মেনে নিতে চাইছেন। সত্যিই কোন্ সেই বিকল্প যা পথে নামা সকলের কাছে সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে? ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এর উত্তর খোঁজাটা সমীচীন, সময়টাও অনুকূল। উত্তর খোঁজার দায় রইল সমস্ত সমাজ বিশ্লেষণী যোগ্যতাসম্পন্ন সচেতন মানুষের ওপর। ❐

তথ্যসূত্র:

সহমন পত্রিকা,
নন্দন পত্রিকা,
কোভিড ১৯—কিছু প্রশ্ন, কিছু উত্তর: স্থবির দাশগুপ্ত
ও অন্যান্য পত্রিকা।

সাহিত্যের চালচিত্রে মহামারী

বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী

মহামারী মানব সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। লিখিত ইতিহাসে প্রথম মহামারী প্লেগ, যাতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর 'ব্ল্যাক ডেথ' ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের ভিত নাড়িয়ে দেয়। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর বিউবোনিক প্লেগের সুযোগ নিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতে শাসকরা দেশীয় প্রজাদের ওপর নামিয়ে আনে দমন ও শোষণ। তেমনই বিংশ শতকে 'স্প্যানীশ ফ্লু' দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগকে জাগ্রত করে। মহামারী এভাবেই কালস্রোতের বাঁকে বাঁকে সমাজ ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে, পরিবর্তন এনেছে, কখনও ভালো কখনও মন্দ। তেমনই মহামারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ভয়াবহতা ও অসহায়তা, জীবন জীবিকার সংকট ও স্বজন হারানোর বেদনা ব্যক্তিমানুষের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ওপরেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। আর এই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাসমূহ যেমন বিজ্ঞান ও সমাজব্যবস্থায় নব নব দিগন্ত খুলে দিয়েছে, তেমনই সৃষ্টি করেছে মননশীল সাহিত্যের এক বিপুল সম্ভার। মহামারী প্রসঙ্গে সাহিত্যে যেমন স্থান পেয়েছে মানবিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধ, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতি, তেমনই কল্পবিজ্ঞান থেকে ভৌতিক প্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গ। আবার বিভিন্ন সার্থক গল্প, উপন্যাস ও নাটকে মহামারীর প্রসঙ্গ এসেছে প্রেক্ষাপট হিসাবে, বিশেষত বাঙলা সাহিত্যে। আজ সারা বিশ্বব্যাপী নভেল করোনা ভাইরাস অতিমারী সভ্যতার যে সংকট ডেকে এনেছে, সেই প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের চালচিত্রে মহামারী বিষয়ে কিছু আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অনুমান করা হয় যে ভাইকিং, মায়া প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতা মহামারীর ফলে ধ্বংস হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর 'ব্ল্যাক ডেথ' প্রথম মহামারী যা তখন পর্যন্ত পরিচিত বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য বা পূর্ব প্রাচ্য-এ এর উৎপত্তি যা সিল্করুট ধরে বাহিত হয়ে পশ্চিম এশিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে। বিউবোনিক প্লেগের আকারে এই রোগ জলপথে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছায় এবং তারপর কোভিড ১৯-এর মতোই মানুষের প্রশ্বাসনিঃসৃত জলকণার মাধ্যমে নিউমোনিক প্লেগরূপে সংক্রমিত করে সারা ইউরোপ মহাদেশ। এই মহামারীর কেন্দ্রস্থল ইতালীর জনজীবনে এর গভীর ও করাল প্রভাব পড়ে, যার সাক্ষ্য বহন করছে বোকাচ্চিও জিওভান্নির চিরায়ত রচনা 'দেকামেরন'। ১৩৫৩ সালে রচিত এই গ্রন্থ মূলত একশত গল্পের সংকলন যা সাতজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ পরস্পরকে বলেন যখন তারা প্লেগের প্রকোপ থেকে বাঁচতে ফ্লোরেন্সের শহরতলীতে আশ্রয় নেন। রস ও বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই রচনাটি সেই সময়ের প্রেক্ষাপটের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দেশ ও কালের নিরিখে 'ব্ল্যাক ডেথ' মহামারীর প্রভাব এতই সুবিস্তৃত ছিল যে তারপর বহুশতাব্দী ধরে এই বিষয়ে বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এরমধ্যে অন্যতম ডেনিয়েল ডিফোর ১৭৭২ সনের লেখা 'A Journal of the plague year'। ১৬৬৫ থেকে ১৬৬৬ সালের গ্রেট প্লেগ অফ লন্ডনের এটি বাস্তবানুগ বিবরণ। ১৮৩০ সালে রুশ ভাষায় রচিত পুশকিনের কাব্যনাটক 'A feast in the time of plague' এবং ১৫৯০ সনে টমাস ন্যাশ রচিত সনেট কবিতা 'A Litany in the time of plague' রচনা দুটিতে 'ব্ল্যাক ডেথ' মহামারীর অনুষঙ্গ আছে। এ বিষয়ে ইঙ্গমার বার্গম্যান রচিত ও নির্দেশিত 'The seventh seal' চলচ্চিত্রের উল্লেখ করতেই হয়। পুশকিনের কাব্যনাটকে

যেমন নায়ক মৃত্যুর রাজত্বকে বিদ্রুপ করেছেন, তেমনই বার্গম্যানের এই চলচ্চিত্রে সুইডেন 'ব্ল্যাক ডেথ' এর পটভূমিকায় নায়ক মৃত্যুর সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন দাবাখেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আলব্যের কামুর ১৯৪৭ সনে রচিত উপন্যাস 'The plauge' ১৮৪৯ সনে আলজেরিয়ার কলেরা মহামারীর প্রেক্ষাপটে রচিত। কাহিনীটি সেই দেশের একটি শহরে বিউবোনিক প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাপ্রবাহ ঘিরে। মহামারীর ভয়াবহতাকে প্রথমে অস্বীকার ও পরে তার করালগ্রাসে মানুষের অসহায়তা ও মৃত্যু, যাতায়াত ও সামাজিক মেলামেশায় প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি বিষয়গুলি যা এই উপন্যাসে বিধৃত তা আজকের করোনা অতিমারীর যুগেও সমান প্রাসঙ্গিক। বাঙলা সাহিত্যে প্লেগের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে। এর মধ্যে অন্যতম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তাঁর রেঙ্গুন পৌঁছানোর বর্ণনা। "চারিদিক হইতে এক অস্ফুটশব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা Quarantine। তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে, ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়।" এই 'কোয়েরান্টাইন' প্রসঙ্গ বাঙলা সাহিত্যে প্রথম শরৎচন্দ্রই নিয়ে আসেন, যা Covid 19-এর দৌলতে আজ বহুল চর্চার বিষয়। ১৮৯৮ সালে প্লেগ কলকাতায় ভয়াবহ মহামারী আকারে দেখা দেয়। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা তখন প্রায় কিছুই ছিল না। এই পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ ও তাঁর সহসন্ন্যাসীরা সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা সেই সময় নিঃস্বার্থ জনসেবায় ব্রতী হয়ে যে আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন তা স্বীকৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে শংকরীপ্রসাদ বসু প্রভৃতি নানা লেখকের জীবনীমূলক সাহিত্যে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস 'মহাস্থবির জাতক' এও এই মহামারী স্থান করে নিয়েছে। এই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, তদানিন্তন কলকাতা কর্পোরেশন প্লেগ প্রতিরোধে টীকাকরণ কর্মসূচী চালু করতে চাইলেও এই প্রয়াস ব্যর্থ হয় কারণ গুজব রটিয়ে দেওয়া হয় যে এই টীকা নেওয়ার ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। কলকাতায় ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীরাই প্রথম এই টীকা নিতে এগিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপনাসে কলকাতায় প্লেগের প্রার্দুভাবের এক মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের চরিত্র জ্যাঠামশাই নিজের বাড়ীতে হাসপাতাল খুলে গরীব রুগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। লেখকদের কাল্পনিক চরিত্ররাই শুধু নয়, প্লেগে প্রাণ হারান তাদের অনেকের নিকট আত্মীয়, যেমন শরৎচন্দ্রের স্ত্রী ও কন্যা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রভৃতি।

প্লেগের পরেই সাহিত্যে যে মহামারীর প্রসঙ্গ সর্বাধিক এসেছে তা হল কলেরা। অনেকের মতে এর উৎপত্তি আমাদের এই বাঙলায়। ১৯১২ সনে প্রকাশিত টমাস মানের ক্ষুদ্র উপন্যাস 'The Death in Venice'-এ কলেরার প্রার্দুভাবের জন্য এশীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সংস্রবকে দায়ী করা হয়েছে। মান সরকাসরি জানিয়েছেন যে উপনিবেশের মূলবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা ও সভ্যতার অভাব আছে। কলম্বিয়ান নোবেল পুরস্কারজয়ী লেখক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ১৯৮৫ সনে রচিত উপন্যাস 'Love in the times of Cholera' মূলত মানবিক সম্পর্কের কাহিনী যাতে কলেরা বিষয়টি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। অনেকে এই উপন্যাসটিকে মানব জীবনে প্রেম বয়োঃবৃদ্ধি ও মৃত্যুর উদ্‌যাপন বলে মনে করেন। তবে আমাদের দেশীয় সমাজে স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার অভাবের অভিযোগ যে একেবারে মিথ্যা নয় তা বোঝা যায় বিভিন্ন বাঙলা গল্প-উপন্যাসে চিত্রিত কলেরা মহামারীর প্রেক্ষিতে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন ও নায়িকা কুসুমের সম্পর্কের টানাপোড়েনে কলেরা গভীর ও করাল ছায়াপাত করেছে। গ্রামের পণ্ডিতমশাই বৃন্দাবন গ্রামে এই মারীর প্রকোপ ঠেকাতে নিজস্ব পেয় জলের পুকুরে স্নান ও কাপড়কাচা নিষিদ্ধ করতে চায়। এইজন্য তাকে জনসাধারণের বিরূপতা ও সমাজপতিদের রোষের

সম্মুখীন হতে হয়। এর পরিণতিতে তার শিশুপুত্র বিনাচিকিৎসায় বিসূচিকার তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যায় ও বৃন্দাবন সেবাব্রত নিয়ে দেশান্তরী হয়। একইরকম ভাবে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের নায়ক শিবনাথকেও কলেরা মহামারীগ্রস্থ গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে আমরা দেখি শুয়োরমারি বস্তিতে কলেরার মড়ক ছড়িয়ে পড়ার খবর পেয়ে নায়ক সত্যচরণকে সেখানে ছুটে যেতে। আমাদের দেশে দারিদ্র, অপরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতার অভাবের ফলেই কলেরার প্রকোপ ও প্রাণহানি এমন ভয়াবহ হতো, এই কাহিনীগুলি সেই বাস্তবতাকেই তুলে ধরে। এসবের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও শুশ্রুষার অভাব মানুষের অসহায়তাকে আরোও প্রকট করে তুলেছিলো। এই কলেরাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিশুপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলায় বিভিন্ন মহামারীর প্রাদুর্ভাব ছিল ব্যাপক। দুর্ভিক্ষ, মাৎসান্যায় প্রভৃতিঅন্যান্য বিপর্যয়ের মতোই মহামারী ছিল স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক ঘটনা, বাঙলার গ্রামেগঞ্জে যার পরিচিত নাম ছিল মড়ক। নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসখ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট শতাংশ লোকের কোনো বিশেষ রোগে আক্রান্ত হওয়াকেই মহামারী বলে, যা নির্ণয় করা বিংশ শতাব্দীর আগে প্রায় অসম্ভব ছিল। এর প্রধান কারণ হল রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণার অভাব ও জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক শাসকের ঔদাসিন্য। ফলত প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া, গুটিবসন্ত, কালাজ্বর প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি একবার ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রাণহানি অবধারিত ছিল। মড়কে মত্যু ও তার থেকে বাঁচবার জন্য গ্রামবাসীদের স্থানান্তরের ফলে অনেক গ্রাম জনশূন্য হয়ে যেত যার বাস্তব বিবরণ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অব্যবহিত পরে বাঙলার পদচিহ্ন নামের একটি গ্রামে মড়কের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন "রোগ সময় পাইলো। জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষত বসন্তের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইল। গহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহারো চিকিৎসা করে না। কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে না। অতিরমণীয় বহু অট্টালিকার মধ্যে আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, যে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া পালায়।" বসন্তের মারীগুটিকা দেখা দিলে রোগীকে সমাজ থেকে দূর করে মৃত্যুমুখে ফেলে পালানোর যে দস্তুর তা সন্ন্যাসী উপগুপ্তের আমল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জেনার সাহেবের টীকা আবিষ্কার পর্যন্ত বজায় ছিল। বসন্তের মতোই আর যে মারীতে বাঙলার বহুগ্রাম বসতিশূন্য হয়েছিল তা হল ম্যালেরিয়া। এরকমই একটি গ্রামের বর্ণনা আছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনিপোতা আবিষ্কার' গল্পে। জল জঙ্গলের দেশ এই বাঙলা ছিল ম্যালেরিয়ার আঁতুড়ঘর এবং এখানেই এর জীবাণু শনাক্ত হয়, যা নিয়ে অমিতাভ ঘোষ লিখেছেন 'The Calcutta Chromosome'। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিভিন্ন রচনায় ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট পল্লী সমাজের প্রসঙ্গ এসেছে। ম্যালেরিয়াজনিত পিলের জ্বর যে বাঙালির চারিত্রিক লক্ষণ হয়ে গিয়েছিল তা সুকুমার রায় সৎপাত্র গঙ্গারামের মধ্যে দিয়ে অক্ষয় করে গেছেন। সুকুমার রায় মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মারা যান কালাজ্বরে। সেই যুগে এই রোগের কোনো চিকিৎসা না থাকার ফলে বহু মানুষ এতে প্রাণ হারান। এই রোগ ধীরে ধীরে মানুষকে অসহায়ভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতো যার করুণ একটি বিবরণ আছে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন' রচনায়। তবে এই একটি মহামারীর ক্ষেত্রে বাঙালী শুধু পড়ে পড়ে মার খায়নি, ১৯২২ সালে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এর প্রতিষেধক ইউরিয়াম স্টিবামিন আবিষ্কার করে কালাজ্বরকে পরাভূত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯১৮ সালে বিশ্বব্যাপী যে 'স্প্যানিশ ফ্লু' মহামারীর প্রকোপ ঘটেছিল, তা সিমলা থেকে বিহার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লেও কোন অজ্ঞাত কারণে বাঙলায় এর বিশেষ প্রভাব পড়েনি। অতএব বাঙলা সাহিত্যে এই মহামারীটি উহ্য থেকে গেছে। অবশ্য হিন্দি সাহিত্যে এই মহামারীর মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায় সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী ওরফে 'নিরালা'-র 'কুল্লিভাত' নামক স্মৃতিকথায়।

বাঙলা সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে গল্প উপন্যাস নাটকে মহামারী এসেছে প্রেক্ষাপট হিসাবে, যার মাধ্যমে উপন্যাসের মূল বক্তব্য বা চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই মূলবক্তব্য কোথাও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় মানুষের দুর্দশা ও ক্ষোভ, কোথাও সামাজিক কুসংস্কার ও গ্রাম্য রাজনীতি, কোথাও দেশের অসহায় মানুষের প্রতি শিক্ষিত যুবসমাজের সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ বা কোথাও মানবিক সম্পর্ক ও স্বজন বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। কিন্তু কামুর 'The plague' এর মতো উপন্যাস সেখানে মহামারী মুখ্য বিষয় এবং চরিত্ররা সেই বিষয়টি ঘিরেই আবর্তিত, বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ লেখা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে বাস্তব রোগজনিত মহামারী ছাড়াও কল্পিত কোনো অভূতপূর্বরোগে মানব সভ্যতার সঙ্কট নিয়ে আন্তর্জাতিক সাহিত্যে কিছু জনপ্রিয় ও সমাদৃত রচনা সৃষ্টি হয়েছে। পর্তুগীজ লেখক হোসে সারামাগোর 'Blindness' উপন্যাসটিতে একটি নামহীন শহরের অধিকাংশ নাগরিক অন্ধত্বের শিকার হতে থাকে। এর ফলে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং তারা অন্ধত্বে আক্রান্ত নাগরিকদের একটি স্থানে পৃথক করে রাখে। এই সমাজ বিচ্ছিন্ন অন্ধ মানুষদের অভিজ্ঞতা এবং বাঁচার তাগিদে তাদের পরস্পরের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক নিয়ে রচিত এই উপন্যাস নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

কল্পিত বিভিন্ন রোগ ব্যাধিজনিত মহামারী নিয়ে যে বিভিন্ন কৌতুহলজনক কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচিত হয়েছে তা বলাইবাহুল্য। সেখানে কোথাও যেমন আছে মহাবিশ্ব থেকে আগত কোনো জীবাণু থেকে ছড়িয়ে পড়া মড়কের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের লড়াই (মাইকেল ক্রিক্টনের The Andromeda Strain), কোথাও আবার যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে মারণজীবাণু তৈরী করার প্রচেষ্টার ফলে অতিমারীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় লোপ পাওয়ার ঘটনা (স্টিফেন কিং-এর The Stand)। শেষোক্ত কাহিনীতে যদি কেউ করোনা অতিমারীর অনুষঙ্গ খুঁজে পান তবে তার জন্য আরও বিস্ময়কর তথ্য এই যে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ডিন কুঞ্জ-এর উপন্যাস 'The Eyes of Darkness'-এ রয়েছে চীনের উহান শহর থেকে উৎপন্ন এক ভাইরাস ঘটিত অতিমারীর বিবরণ।

সাহিত্যের চালচিত্রে মহামারী আলোচনাটি শেষ করবো এই সংক্রান্ত ভয়ঙ্কর রসের সাহিত্য সম্বন্ধে দু-এক কথা দিয়ে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সাহিত্যে সবচেয়ে প্রচলিত ছকটি হল মারণরোগের জীবাণু সংক্রমণের ফলে মানবসমাজের একাংশের রক্তলোলুপ পিশাচে পরিণত হওয়া। এই Zambie apocalypse ধরণের ভূরি ভূরি গল্প উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে গিয়ে বাংলা সাহিত্যে দুটি ছোট গল্পের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমটি মনোজ বসুর গল্প 'জামাই'। বিনোদ সারাদিন যাত্রা করে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে স্ত্রীর কাছে কিছু খেতে চায়। তারপর তার যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়, তার শেষ পর্বে সে জানতে পারে যে মহামারীতে তার স্ত্রী সহ শ্বশুড়বাড়ির সকলে মারা গেছে, গোটা গ্রামটি ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রঙ্কিনী দেবীর খড়্গ' গল্পটিতে মানভূমের একটি গ্রামে লৌকিক দেবী অলৌকিক উপায়ে গ্রামবাসীকে কলেরা মহামারীর আগাম সূচনা দেন।

বিস্রস্ত '২০২০' সালে সমগ্র বিশ্ব আজ নভেল করোনা অতিমারীতে আক্রান্ত, মৃত্যুমিছিল অব্যাহত, সামাজিক মেলামেশা ও বিনোদন নিয়ন্ত্রিত, গণপরিবহন ব্যাহত, রোগ নিরাময় বা প্রতিরোধের উপায় দূরপারাহত। তবু "মন্বন্তরে মারিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি, বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির আশিসে অমৃতের টীকা পরি"—এই আশা ও ভরসা নিয়ে এই বিপর্যয় একদিন আমরা কাটিয়ে উঠব। দুর্দশা ও অসহায়তা থেকে মুক্তি পেয়ে মানবের ধারা নবোদ্যমে ধাবিত হবে আনন্দ ও মঙ্গলের লক্ষ্যে। আর এই দুর্দশাগ্রস্ত সময়ের উপাদানগুলি নিয়ে তখন রচিত হবে বিবিধ ও বিচিত্র আখ্যান, যার আলোকে আমরা, যারা এই সময়কে প্রত্যক্ষ করেছি, মিলিয়ে নিতে পারব আমাদের অভিজ্ঞতা, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য থাকবে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে চেনা-জানার সুযোগ ও তাকে জয় করার অনুপ্রেরণা।

‘মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও’

কোভিড অতিমারীতে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদ থেকে সমিতিগতভাবে আমরা লাগাতার কর্মসূচী পালন করার প্রচেষ্টা জেলা কমিটিগুলির তৎপরতায় সাধ্যমতো জারি রেখেছিলাম—যুগপৎ ‘লকডাউন’ এবং আনলক পর্বের কঠিন দিনগুলোতে। অনুগামী সদস্যদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত এইসব কর্মসূচীর একটা বিবরণ নীচের সারণীতে তুলে ধরা হল:—

ক্রম	তালিকা	জেলা	স্থান	উপকৃত পরিবার
১.	২৩/৪/২০২০	পশ্চিম মেদিনীপুর	খড়্গপুর পুরসভা	৩০
২.	২৪/০৪/২০২০	উত্তর দিনাজপুর	কর্ণজোড়া, হাটখোলা	১৫৫
৩.	২৬/০৪/২০২০	মালদহ	পলাশবাড়ি, উঃ চন্ডিপুর	৬০
৪.	২৭/০৪/২০২০	মুর্শিদাবাদ	আম্বেদকর কলোনি,	১১০
৫.	২৯/০৪/২০২০	হাওড়া	ভেন্টপোতা, বাহিরাজিপি, উলুবেড়িয়া	১৫৪
৬.	২৯/০৪/২০২০	দার্জিলিং	লেপার্স বস্তি, শিলিগুড়ি	৪০
৭.	২৯/০৪/২০২০	কোচবিহার	কোচবিহার টাউন	২৩
৮.	৩০/০৪/২০২০	পুরুলিয়া	কদমখালি, ওয়ার্ড ২০, পুরুলিয়া পৌরসভা	৭০
৯.	২/০৫/২০২০	পশ্চিম বর্ধমান	মহীশিলা কলোনি, আসানসোল	৬৫
১০.	২/০৫/২০২০	দার্জিলিং	বেতপাড়া, মালুগাড়া	১০০
১১.	৪/০৫/২০২০	কোচবিহার	কোচবিহার টাউন	১৭
১২.	৫/০৫/২০২০	জলপাইগুড়ি	দিশারী ক্লাব প্রাঙ্গণ	৫০
১৩.	৬/০৫/২০২০	কোচবিহার	কোচবিহার টাউন	১৯
১৪.	৭/০৫/২০২০	পূর্ব বর্ধমান	সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রাঙ্গণ	১০০
১৫.	৯/০৫/২০২০	পশ্চিম মেদিনীপুর	শালবনী ব্লক কম্যুনিটি হল	১২৫
১৬.	১০/০৫/২০২০	দার্জিলিং	মাজিয়া বস্তি, মাটিগাড়া	১০০
১৭.	১০/০৫/২০২০	জলপাইগুলি	দমদমা বস্তি, রাজগঞ্জ	১০০
১৮.	১৫/০৫/২০২০	পশ্চিম মেদিনীপুর	দাসপুর-১ ব্লক	১২০
১৯.	১৮/০৫/২০২০	নদীয়া	কৃষ্ণনগর স্টেডিয়াম	১২০০
২০.	২৩/০৫/২০২০	পশ্চিম মেদিনীপুর	অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রম	৩০০
২১.	২৯/০৫/২০২০	নদীয়া	কৃষ্ণনগর স্টেডিয়াম	১২০০
২২.	৩০/০৫/২০২০	নদীয়া	কৃষ্ণনগর স্টেডিয়াম	১২০০
২৩.	৩১/০৫/২০২০	পূর্ব মেদিনীপুর	নিমতৌড়ি, তমলুক	১৪৫
২৪.	৪/০৭/২০২০	বাঁকুড়া	বিষ্ণুপুর	৬৭
			মোট	**৫৫৫০**

‘কোভিড অতিমারীর মধ্যেই ‘আমফান’ উদ্ভুত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুর্গত মানুষজনের পাশে দাঁড়নোর কেন্দ্রীয় কর্মসূচীতে যে-সমস্ত উদ্যোগ গৃহীত হয়েছেঃ—

২৫.	২৩/০৬/২০২০	উঃ ২৪ পরগনা	হাসনাবাদ ঘুনী আদর্শ বিদ্যালয়	১৯৮
২৬.	১৪/০৯ ও ১৫/০৯/’২০	দঃ ২৪ পরগনা	খেয়াদা উচ্চ বিদ্যালয়, সোনারপুর	৭৩০
২৭.	২৬/০৯/২০২০	দঃ ২৪ পরগনা	কাটাখালি গ্রাম, গোসাবা	২০০
২৮.	২১/১০/২০২০	দঃ ২৪ পরগনা	বয়নালা গ্রাম, ভাঙ্গড়	২০০

এরই পাশাপাশি গত ৬ই জুন ২০২০ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও গত ১২ই জুলাই ২০২০ তারিখে পশ্চিম বর্ধমান জেলার উদ্যোগে ‘রক্তদান শিবির’ সংগঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই সবমিলিয়ে শতাধিক মানুষ এই শিবিরগুলিতেরক্তদান করে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

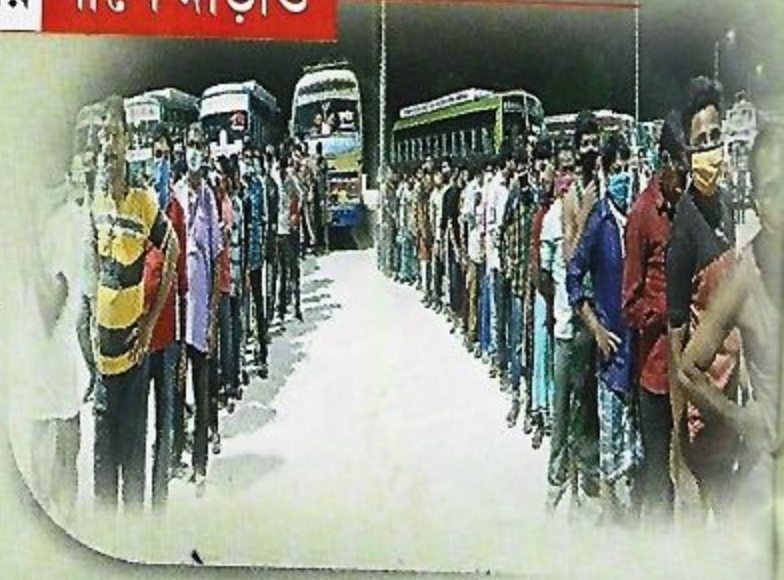

মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

With Best Compliments From:-

Asim Das

HOW-41

সম্পাদক ঃ অম্লান দে

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯